গুরুবাক্য বা যৌগিকপন্থা

চতুর্থ ভাগ।

কঠিন রোগের সহজ চিকিৎসা

—:*:—

যোগপ্রকাশ ব্রহ্মচারী প্রণীত

গুরুবাক্য কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।
পোঃ—দাসের জঙ্গল, জিলা ফরিদপুর।

সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত

মূল্য ১।০ আনা

প্রকাশক—
রায় যোগেশচন্দ্র মজুমদার,
গুরুবাক্য কার্য্যালয়।
পোঃ—দাসেরজঙ্গল, জিলা—ফরিদপুর।

প্রথম সংস্করণ
শ্রাবণ, ১৩৪৭

প্রিণ্টার—ননীগোপাল রায় চৌধুরী
বিজলী প্রেস,
১০৫নং রসা রোড, কলিকাতা।

প্রস্তাবনা

গুরুবাক্য "চতুর্থ ভাগ" সর্ব্বসাধারণের উপকারার্থে প্রকাশ করিলাম। সাধু মহাত্মাদের নিকটে কঠিন কঠিন রোগের যে সমস্ত ঔষধ পাইয়াছি এবং গো-চিকিৎসা সম্বন্ধে যে সমস্ত সহজ প্রণালী জানিয়াছি তাহা এই বহিতে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে এবং বহির তৃতীয় উল্লাসে মৃত্যু পরীক্ষা সম্বন্ধে যে সব সহজ প্রণালী আছে, তাহা প্রকাশ করিয়াছি।

ইহা দ্বারা যদি কাহারও কিছু উপকার হয়, তবে পরিশ্রম সার্থক মনে করিব। ইতি—

যোগপ্রকাশ ব্রহ্মচারী

সূচীপত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা
১।	রোগ চিনিবার উপায়	১
২।	মুখে রোগের লক্ষণ	২
৩।	জিহ্বায় রোগের লক্ষণ	২
৪।	শ্বাসে রোগের লক্ষণ	২
৫।	বমন ও হিক্কা	৩
৬।	মলে রোগের লক্ষণ	৩
৭।	মূত্রে রোগের লক্ষণ	৩
৮।	বেদনায় রোগের লক্ষণ	৪
৯।	সাধারণ পথ্য	৪
	মূত্রযন্ত্রের পীড়া	
১০।	মুত্রশীলা বা পাথরী	৫
১১।	মুত্রকৃচ্ছ্র বা মূত্রাভাব	৬
১২।	অবারিত মূত্র—অধিক প্রস্রাব	৭
১৩।	প্রমেহ (গণোরিয়া)	৯
১৪।	রক্তপ্রস্রাব	১১
	স্ত্রীরোগ	
১৫।	রজঃকৃচ্ছ্র (বাধক) চিকিৎসা	১২
১৬।	রজঃস্তম্ভ বা নষ্ট ঋতু	১৩
১৭।	রক্তপ্রদর ও অতিরজঃ রোহিণী	১৪

বিষয়			পৃষ্ঠা
১৮।	শ্বেতপ্রদর	....	১৬
১৯।	মৃতবৎসা দোষ	....	১৭
২০।	পারদ নিবারনের উপায়	...	১৮
২১।	প্রসূতির স্তনে দুগ্ধ বৃদ্ধি হইবার ঔষধ	....	১৯
২২।	চুলকানী বা খাজলীর অব্যর্থ ঔষধ	....	১৯
২৩।	রাতকাণার ঔষধ	....	২০
২৪।	হাঁপানীর ঔষধ	....	২০
২৫।	মৃগীরোগের আশ্চর্য্য ঔষধ	....	২০
২৬।	মাথাধরার আশ্চর্য্য ঔষধ	....	২১
২৭।	ক্রিমির বেদনা আরোগ্যের উপায়	....	২২
২৮।	বিশেষ বিধি—পঞ্চামরা	....	২২
২৯।	পাঁচটা অমর জিনিষ কি	...	২৩
৩০।	পঞ্চামরা তৈয়ারীর বিধান	...	২৪
৩১।	গোচিকিৎসা	...	২৭
৩২।	গাভীর দুগ্ধ বৃদ্ধি হইবার উপায়	...	৩১
৩৩।	দীর্ঘকাল দুগ্ধ টাটকা রাখিবার উপায়	...	৩৪
৩৪।	দুগ্ধপরীক্ষার সহজ উপায়	...	৩৪
৩৫।	গাভীর দুগ্ধ সর্প না খাইতে পারে তাহার উপায়		৩৫
৩৬।	কোন্ কোন্ গাভীর দুগ্ধ হিতকর	...	৩৫
৩৭।	গরু বিষ ভক্ষণ করিলে আরোগ্যের উপায়	...	৩৬
৩৮।	গলাফুলা আরোগ্যের উপায়	...	৩৭

বিষয়		পৃষ্ঠা
৩৯।	দুগ্ধবতী গাভীর লক্ষণ ...	৩৮
৪০।	গরুর খরুয়া রোগ আরোগ্যের উপায় ...	৩৯
৪১।	ক্ষিপ্ত কুকুর কিংবা শৃগাল দংশন আরোগ্যের উপায়	৪১
৪২।	অগ্নিতে পোড়া ঘা আরোগ্যের উপায়	৪২
৪৩।	জিহ্বার ঘা আরোগ্যের উপায়	৪২
৪৪।	ভস্ম করিবার নিয়ম	৪২
৪৫।	আঘাত আরোগ্যের ঔষধ	৪৩
৪৬।	কাউর ঘা আরোগ্যের উপায় ...	৪৩
৪৭।	বাঁটের ঘা আরোগ্যের উপায় ...	৪৪
৪৮।	সর্প দংশন আরোগ্যের উপায় ...	৪৪
৪৯।	ক্রিমি রোগ আরোগ্যের উপায় ...	৪৫
৫০।	পেট কামড়ানি আরোগ্যের উপায় ...	৪৬
৫১।	পেট ফাঁপা আরোগ্যের উপায় ...	৪৬
৫২।	শিং ভাঙ্গা আরোগ্যের উপায় ...	৪৭
৫৩।	গাভী প্রসব করাইবার সহজ নিয়ম	৪৭
৫৪।	প্রসবদ্বার ফাটা আরোগ্যের উপায়	৪৮
৫৫।	সূতিকা রোগ বা দুগ্ধ-জ্বর আরোগ্যের উপায়	৪৮
৫৬।	বসন্ত	৪৮
৫৭।	লক্ষণ	৪৯
৫৮।	গরুর বসন্ত না হইবার উপায়	৫১
৫৯।	গরুর বসন্ত ভাল হইবার একটা ভাল ঔষধ	৫২

বিষয়				পৃষ্ঠা
৬০।	গরুর পাতলা বাহ্যি (ছেড়) হইলে আরোগ্যের উপায়			৫২
৬১।	সুলক্ষণ ও কুলক্ষণ বিশিষ্ট গাভী		....	৫২
৬২।	কোন গরুকে কিরূপ খাদ্য দিতে হয় ?		....	৫৩
৬৩।	গোয়াইল ঘর প্রস্তুত করিবার নিয়ম		....	৫৩
৬৪।	পূর্ব্ব সূচনা	....	....	৫৪
৬৫।	মৃত্যু পরীক্ষা	....	....	৫৫
৬৬।	মৃত্যু লক্ষণ	....	....	৬৮
৬৭।	প্রতিকারের উপায়	....	....	৭৬
৬৮।	স্বপ্নফল	....	....	৮১
৬৯।	মৃত্যুশূচক স্বপ্ন	....	....	৮৪
৭০।	তপস্যা	....	....	৯৯
৭১।	দীর্ঘায়ু ও অল্পায়ু হইবার কারণ		....	১১০

নমঃ নারায়ণায় নমঃ

রোগ চিনিবার উপায়

নাড়ী

শরীরের যে সকল স্রোত (নালী) দ্বারা হৃৎপিণ্ড হইতে সর্ব্বশরীরে রক্ত প্রবাহিত হয়, তাহাদিগকে ধমনী বা নাড়ী কহে। সাধারণতঃ মণিবন্ধে নাড়ীর গতি পরীক্ষা হইয়া থাকে। বিচক্ষণ চিকিৎসকগণ নাড়ীর গতি দেখিয়াই রোগ নির্ণয় করিতে পারে।

শীত

শরীরের শারীরিক তাপ রক্তযন্ত্রের ভিতর প্রবেশ করিলে শরীরের বাহিরের চর্ম্মে শীতলতা প্রকাশ পায়, সেজন্য শীত ও কম্প উপস্থিত হইয়া থাকে।

মুখে রোগের লক্ষণ

মুখমণ্ডল দেহের দর্পণস্বরূপ। রোগ অবস্থায় প্রশান্ত ও প্রসন্ন মুখাকৃতি সুলক্ষণ জানিবে, কিন্তু হৃদরোগে অনেক যন্ত্রণার পর রোগী প্রশান্ত ভাব ধরিলে তাহা ভাল নহে। নাসাগ্রের সূক্ষ্মতা, নয়নের নিম্নতা, ললাট-প্রান্তের অবনতি, ললাট-ত্বকের কুঞ্চিত ভাব, কর্ণলতিকার উৎপতিতা, মুখমণ্ডলে হরিৎ, কৃষ ও নীল বা সীসকবৎ বর্ণ মৃত্যুর আসন্ন লক্ষণ জানিবে।

জিহ্বায় রোগের লক্ষণ

জিহ্বার শুষ্কতা তরুণ জ্বরের লক্ষণ, অত্যন্ত আরক্ততা স্ফোট জ্বরের লক্ষণ, প্রান্ত ও অগ্রভাগের আরক্ততা পিত্তজ্বরের লক্ষণ, বিদারিত জিহ্বা সান্নিপাতের লক্ষণ, লেপাবৃত জিহ্বা সর্ব্বপ্রকার জ্বরের লক্ষণ। লঙ্কা মরিচের গুড়ার ন্যায় লাল জিহ্বা আরক্ত জ্বরের লক্ষণ মধ্যভাগ লেপাবৃত ও প্রান্তদেশ আরক্ত জিহ্বা বিলেপী জ্বরের লক্ষণ।

জিহ্বার প্রান্তভাগ হইতে ক্রমশঃ পরিষ্কার হইতে থাকিলে রোগ আরোগ্য হইবার ব্যবস্থা বুঝিতে হইবে। অন্যথায় ক্রমে কপিলবর্ণ মলিন ও শুষ্ক হইতে থাকিলে রোগীর বিপদের আশঙ্কা মনে করিবে।

শ্বাসে রোগের লক্ষণ

শ্বাস সহজ ভাবে চলিলে সন্দেহের কারণ নাই। ঘন ঘন শ্বাস ফেলিলে বা সুদীর্ঘ শ্বাস ফেলিতে থাকিলে রোগ

কঠিন বুঝিতে হইবে। দীর্ঘশ্বাস হৃদপিণ্ডের অবসন্নতার লক্ষণ জানিবে।

বমন

আমাশয়ের উপদাহ ; মস্তিষ্ক হৃদপিণ্ড, ফুসফুস এবং জরায়ু প্রভৃতির বৈলক্ষণ্য বশতঃ বমনোদ্রেক হইয়া থাকে।

হিক্কা

বক্ষোদর ব্যবচ্ছেদক, পেশীর ক্ষণস্থায়ী আকুঞ্চন বশতঃ হিক্কার উৎপত্তি হইয়া থাকে। নানা পীড়ার সঙ্গে হিক্কা প্রকাশ পাইয়া থাকে।

মলে রোগের লক্ষণ

কর্দ্দমবর্ণ মলে পিত্তের অভাব, যকৃতের দোষ, কৃষ্ণবর্ণ মলে পিত্তাধিক্য, ইহাও যকৃতের ক্রিয়ার বৈলক্ষণ জানিবে। সবুজবর্ণ মলে পাকস্থলীর অম্লত্ব, মলে আমরক্ত অন্ত্রের প্রদাহসূচক চাউল ধোয়া জলের মত মলে ওলাউঠা বা কলেরা এবং আমাশয় মলে অন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির প্রদাহ জানিবে। কঠিন ও শুষ্ক মলে উহার স্তব্ধতা বা শিথিলতা জন্মে।

মূত্রে রোগের লক্ষণ

সুস্থকায় পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিগণের দৈনিক /১ সের হইতে /১৸৵৹ ছটাক পরিমাণ মূত্র নিঃসৃত হয়। লোহিত ও স্বল্প মূত্র প্রদাহ প্রকাশক ; প্রচুর পরিমাণে পরিষ্কার মূত্র নিঃসৃত হইলে স্নায়বীয় রোগ, মূত্রের বর্ণ দুগ্ধবৎ হইলে ক্রিমি, ধূমবর্ণে রক্তের

অম্লতা, গাঢ় হরিদ্রাবর্ণে পিত্তের বৃদ্ধি, লহিতবর্ণে অম্লত্ব, মুত্রের আবিলতা, মুত্রের অধঃপতিত পদার্থে শ্লেষ্মা বা পুঁযের বর্ত্তমানতা সাধারণতঃ হৃদরোগ, মুত্রে শর্করা মধু মেহের লক্ষণ, মুত্রে শুক্র থাকিলে শুক্রমেহ বুঝা যায়।

বেদনায় রোগের লক্ষণ

প্রদাহের বেদনা চাপিলে এবং পেশীর বেদনা সঞ্চালনে বৃদ্ধি পায়। চাপিলে ও সঞ্চালনে স্নায়ুশূলের বেদনার কোন পরিবর্ত্তন ঘটে না। যকৃতের প্রদাহ হইলে দক্ষিণ স্কন্ধে এবং হৃদপিণ্ডের পীড়ায় বাম বাহুতে বেদনা অনুভব হয়।

সাধারণ পথ্য

তরুণ রোগ মাত্রেই তরল পথ্য ব্যবস্থেয়। পুরাতন রোগে পাকস্থলীর অবস্থা ও শক্তি দেখিয়া নির্দ্দোষ ও লঘুপাক খাদ্য দ্রব্য ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। রোগ ১৫ দিনের উপর হইলেই তাহাকে পুরাতন রোগের মধ্যে জানিয়া যাহাতে রোগীর শরীরে বল থাকে এরূপ খাদ্য দিবে অর্থাৎ অন্ন পথ্যই এ ক্ষেত্রে দেওয়া কর্ত্তব্য।

মূত্রযন্ত্রের পীড়া

মূত্রশীলা বা পাথরী

লক্ষণ—মূত্রাশয়ে যে চূর্ণময় নিরেট পদার্থ সঞ্চিত হয় তাহাকে মূত্রাশীলা বা পাথরী রোগ বলে। পরিত্যক্ত মূত্রের নীচে যে তলানী পড়ে, ঐ পদার্থ মূত্রাশয়ে সঞ্চিত হইলে ক্রমে শক্ত হইয়া প্রস্তরবৎ পদার্থ উৎপন্ন হয়। এই মুত্রশীলা ক্ষুদ্র ও বৃহৎ নানা রকমের হইয়া থাকে, ইহা বড়ই যন্ত্রণাদায়ক ব্যাধি।

চিকিৎসা

১। গোরক্ষ কাঁকুড়ের মূল বাটিয়া বাসিজল সহ খাইলে পাথরী রোগ ভাল হয়।

২। শালিঞ্চার মূলের কাথ কাঁচা হরিদ্রার সহিত বাটিয়া পান করিলে মূত্রশীলা জল হইয়া যায়।

৩। নারিকেলের ফুল ও গুবাক একত্র করিয়া খাইলে লিঙ্গের অভ্যন্তরের পাথরী গলিয়া নীরোগ হয়।

কুপথ্য

চিনি, মিষ্টদ্রব্য, মাখন, ঘৃত, সব, চর্ব্বি, চা, কাফি, মদিরাদি উত্তেজক দ্রব্য সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিবে।

পরিশ্রুতি (distilled) জলের সহিত সোডা মিশ্রিত করিয়া /॥০ সের, /৷০ পোয়া পান করিলে মূত্র-রেণু দ্রবীভূত হয়।

সরস উদ্ভিদ, ফল, লেবুর রস ও দুগ্ধ সুপথ্য।

মূত্রকৃচ্ছ্র বা মূত্রাভাব

লক্ষণ মূত্রকৃচ্ছ্র স্বয়ং কোন ব্যাধি নহে। মূত্রাশয় প্রদাহ অশ্মরী, ক্রিমি, কৃত্রিম মৈথুন বা জরায়ুর স্থান ভ্রষ্টতা হইতে হয়। গ্রন্থিবাত, গুল্ম, বায়ুর সহিতও মূত্রকষ্ট থাকে। ইহাতে ঘন ঘন মূত্র প্রবৃত্তি, বেগ ও বিক্ষেপ অল্প অল্প মূত্র নিঃসরণ হয়, মূত্রত্যাগে জ্বালা ও বেদনা হয়। এই বেদনা মূত্রাশয়ে উপস্থের প্রান্তে, বস্তিকোটরে এবং ঊরুর নিম্ন পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়া থাকে।

মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ প্রদাহিক ও স্নায়ুবিক ভেদে দুই প্রকার। তরুণ রোগে যন্ত্রণা বৃদ্ধি হইলে কারণের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া আরোগ্যকর ঔষধের ব্যবস্থা তৎক্ষণাৎ করিবে।

চিকিৎসা

১। অর্দ্ধ তোলা স্থলপদ্ম গাছের পাতার ডাটা আধাছেঁচা করিয়া /০ একছটাক জলে প্রস্তর পাত্রে করিয়া রাত্রিতে শিশিরে রাখিবে। পরদিন প্রাতে চটকাইয়া ছাকিয়া ছাকাগুলি ফেলিয়া দিয়া জলটুকু খাইবে। ইহাতে প্রস্রাব খোলসা হইবে।

২। কেসুরের ছোট একটি গাছ শিকড় সমেত তুলিয়া ১ মুষ্টি আতপ চাউল সহ /৵০ আধ পোয়া জলে রগড়াইয়া সেই জল খাইবে। ইহাতে প্রস্রাব পরিস্কার ও অধিক হইবে।

৩। কুলের (বড়ই) পাতার কুঁড়ি বাটা ১ তোলা ৵৹ আধ পোয়া জলে গুলিয়া পুনঃ পুনঃ নাড়িলে ফেনা উঠিবে, ঐ ফেনা ফেলিয়া পরে যে জল থাকিবে তাহা খাইলে প্রস্রাব উত্তম খোলসা হইবে।

৪। গেঁদাফুলের পাতা বাটিয়া তলপেটে প্রলেপ দিলে অবিলম্বে প্রস্রাব হইবে।

৫। গরম জলপূর্ণ বোতলের সেঁক তলপেটে দিলেও সত্বর প্রস্রাব হইয়া থাকে।

৬। জলেতে সোরা ভিজাইয়া তলপেটে নেকড়ার পটী দিলে সকালে প্রস্রাব হইবে।

৭। হিমসাগরের (পাথরকুচী বা পাথরশীলা) পাতা বাটীয়া নাভির চারিদিকে প্রলেপ দিলে অনতিবিলম্বে প্রস্রাব হইবে।

পথ্য

প্রস্রাব পরিষ্কার না হওয়া পর্য্যন্ত কোন পথ্য দিবে না। রোগী ক্ষুধায় কাতর হইলে দুগ্ধ ও ডাবের জল দিতে পারা যায়।

অবারিত মূত্র—অধিক প্রস্রাব

• লক্ষণ—এই রোগে মূত্র ধারণের ক্ষমতা কিয়ৎ পরিমাণে বা সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়। মূত্রাশয়ের পেশীতন্তুর ক্ষীণতা বশতঃ মূত্রনিঃসরণ শক্তি বিলুপ্ত হয়। সুতরাং মূত্রাশয়ে মূত্র

পূর্ণ থাকে এবং অবিরত বিন্দু বিন্দু মূত্র ক্ষরিত হয়। উপঘাত, প্রসবকষ্ট, অশ্মরী সঞ্চয়-কৃমির উপদাহ প্রভৃতি কারণে মূত্রাশয় গ্রীবার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী পেশীতন্তুর পক্ষাঘাত বশতঃ এই রোগ জন্মে। রাত্রিতে প্রকোপ বৃদ্ধি হয়।

চিকিৎসা

১। মিছরীপানার সহিত একটি চাঁপাকলা বা মর্ত্তমানকলা চটকাইয়া খাইলে প্রস্রাব ভাল হয়।

২। আতপ চাউল ভাজিয়া চুর্ণ করিয়া চিনি সমভাগে মিলাইয়া /৵০ আধ পোয়া পরিমাণে রাত্রিতে খাইলে প্রস্রাবের দোষ নষ্ট হইবে।

৩। অপরাহ্নে ঘৃতপক্ক লুচি ও চিনি সপ্তাহ কাল আহার করিলে প্রস্রাবের দোষ সংশোধিত হয়।

৪। যজ্ঞডুমুর ভাতে দিয়া তৈল সহ মাখিয়া ভাতের সহিত খাইলে ২।৩ দিনে ঐ রোগ ভাল হয়।

কুপথ্য

অধিক পরিমাণে লবণ ভক্ষণ নিষেধ, কাঁচা লবণ খাওয়া ভাল নয়। শয়নের পূর্ব্বে উষ্ণজলে উপবেশন ও পৃষ্ঠের নিম্ন-ভাগ জলসিক্ত বস্ত্রখণ্ডদ্বারা মার্জ্জিত করা কর্ত্তব্য।

প্রমেহ (গণোরিয়া)

লক্ষণ—মূত্রমার্গের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির প্রদাহ ও স্রাব নিঃসরণকে প্রমেহ বলে। প্রমেহ স্পর্শ-সংক্রামক রোগ, প্রমেহ বিষ সংস্পর্শে বা কখন অন্যান্য কারণেও উৎপন্ন হয়। প্রমেহ স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই হইয়া থাকে। সচরাচর অপবিত্র সংসর্গ বশতঃই হয়। ঋতুমতী ও তীব্র প্রদরাদি স্রাবশীলা স্ত্রী-সংসর্গে, মূত্রের অম্লত্ব, অতি মৈথুন প্রভৃতি কারণে এ রোগ জন্মিয়া থাকে। বিষ সংক্রামণের তৃতীয় অথবা চতুর্থ দিবসে মূত্রমার্গে অল্প কণ্ডুয়ণ, উত্তাপ, আরক্তা ও জ্বালা জন্মে এবং পাতলা সাদা স্রাব নিঃসৃত হইয়া থাকে। ২।৩ দিনের মধ্যেই মূত্রমার্গ স্ফীত হইয়া উঠে এবং প্রদাহ বৃদ্ধি হইয়া অধিক পরিমাণে গাঢ় নীল শুক্র বা হরিদ্রা বর্ণ কখন বা রক্তাক্ত স্রাব নির্গত হয়। মূত্র ত্যাগে অত্যন্ত কষ্ট হয়। পরে সাত অথবা চৌদ্দ দিনের পর ক্রমে ক্রমে হ্রাস হয় বা পুরাতন অবস্থা প্রাপ্ত হয়, পুরাতন অবস্থাতেও মূত্রত্যাগে জ্বালা ও পীতবর্ণ স্রাব ক্ষরিত হয়। পরে পাতলা স্বচ্ছ শুক্রস্রাব নির্গত হইতে থাকে, ইহাকেই লাল মেহ বলে।

চিকিৎসা

১। আধ পোয়া মেন্দিপাতা বাটিয়া /।• এক পোয়া দুধের সহিত মিলাইয়া ছাকিয়া তিন চারিদিন সেবন করিলে প্রমেহ ভাল হয়।

২। ইশবগুল চূর্ণ ৮।১• ঘণ্টা শীতল জলে ভিজাইয়া রাখিয়া পরে নেকড়ায় ছাকিয়া ২।৪ দিন সেবনে প্রমেহ ভাল হয়।

৩। ভূঁই কুমড়ার রস আধ ছটাক, এক কাঁচা দুধের সহিত মিলাইয়া কয়েক দিন খাইলে বিংশতি প্রকার মেহ রোগ ভাল হয়।

৪। হংস ডিম্বের ১টি কুসুম ।/০ ছটাক শীতল জলের সহিত তাড়ন করিয়া পরে বেশ মিলাইয়া লইয়া খাইলে প্রমেহের দরুণ ধাতুক্ষরণ ও জ্বালা যন্ত্রণা ভাল হয়।

৫। চন্দন তৈল ১০ ফোঁটা, গঁদ ভিজান জল আধ ছটাক একত্রে প্রত্যহ প্রাতে সেবন করিলে, প্রমেহ জনিত জ্বালা যন্ত্রণা বিদূরিত হইবে।

৬। সেফালিকা ফুল গাছের পাতা ৫ তোলা ভালভাবে পিষিয়া ২ তোলা ইক্ষুগুড় মিলাইয়া আধ পোয়া জলের সহিত ছানিয়া খাইলে প্রমেহ ও জরদ প্রস্রাব, যন্ত্রণা ও কুটকুট জ্বালা ভাল হয়।

৭। আধ ছটাক তেজপাতার ডাটা /৵০ আধ পোয়া জলে ৮।১০ ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিয়া সেই জল প্রাতে সপ্তাহ কাল সেবন করিলে প্রমেহ রোগ নিশ্চয় আরোগ্য হয়।

৮। যজ্ঞডুমুরের আঠা ॥০ তোলা মধু ॥০ তোলা প্রত্যহ প্রাতে একত্র করিয়া খাইলে প্রমেহ নষ্ট হইয়া ধাতু পুষ্ট ও তেজ বৃদ্ধি হইবে এবং দুর্ব্বলতা ঘুচিবে।

পথ্যাপথ্য

পিয়াজ, রসুন ও উত্তেজক আহার একেবারে নিষিদ্ধ। এই রোগের প্রথম অবস্থায় মাছ, মাংস, ডিম প্রভৃতি খাওয়া উচিত নয়। ঠাণ্ডা জিনিষ খাইলে গিঠে বাত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা।

অনেকে মনে করেন ঠাণ্ডা করিলে বা ঠাণ্ডা জিনিষ খাইলে সত্বর উপশম হইবে। কিন্তু তাহা নয়, বরঞ্চ ঠাণ্ডা না করিয়া সাধারণভাবে ডাল, ভাত, তরকারী ও ফলাদি ভক্ষণ করিবে। বৈকালবেলা রুটি বা খৈ দুধ খাইলে ভাল হয়। যদি বাতে আক্রমণ করে তবে সহজে আরোগ্য হওয়ার আশা নাই। এমন কি কেহ কেহ একেবারে অচল হইয়াও পড়ে।

রক্তপ্রস্রাব

লক্ষণ—মূত্রের সহিত রক্ত নিঃসৃত হইলে তাহাকে রক্ত প্রস্রাব কহে। এই রক্ত মূত্রবাহী প্রণালী মূত্রাশয় বা মূত্রমার্গ হইতে নির্গত হয়। মূত্রে রক্তের বিদ্যমানতা সহজেই জানিতে পারা যায়। কিন্তু কাহারও প্রস্রাবে এত অল্প পরিমাণে রক্ত মিশ্রিত থাকে যে, সহজে টের পাওয়া যায় না।

চিকিৎসা

১। তুলসী পাতার রস ১ তোলা, কিঞ্চিৎ ইক্ষুচিনি সহ পান করিলে ১ দিনে রক্তস্রাব ভাল হইবে।

২। বাসকের পাতা কলার পাতা দ্বারা বেষ্টন করিয়া অগ্নিতে ঝলসাইয়া তাহার ২ তোলা রস, দ্বিগুণ মধু সহ সেবন করিলে রক্ত প্রস্রাব ভাল হইবে।

৩। গাবের বীচি, গুলঞ্চ, কিসমিশ একত্রে ২ তোলা, আধ সের জলের সহিত জাল দিয়া /৶০ আধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া ২ বেলা খাইলে রক্তপ্রস্রাব ভাল হয়।

পথ্য—সহজ পাচ্য সরস পথ্য বিধেয়। আহার, নিদ্রা ও পরিশ্রমে সমতা রাখিবে।

স্ত্রীরোগ

রজঃকৃচ্ছ্র (বাধক)

লক্ষণ—ঋতুকালে অতিশয় বেদনা হইলে তাহাকে রজঃশূল বা বাধক বলে! এ বেদনা পৃষ্ঠের নিম্ন ভাগ দিয়া ও নিম্নোদরের সমস্ত প্রদেশে ও মাজাতে প্রকাশ পাইয়া থাকে। বাধক বেদনায় অল্প পরিমাণে রজঃস্রাব হইয়া থাকে। বাধক নানাপ্রকার। যে বাধক জরায়ুর মধ্য হইতে কৃত্রিম ঝিল্লি উৎপন্ন হইয়া বাম পার্শ্বে অধিকতর বেদনা হয় সেই বাধকেই বন্ধ্যাত্ব জন্মে। বাধকের যন্ত্রণা কম নহে, ক্ষীণা ও দুর্ব্বলা স্ত্রীলোকের, রক্ত-প্রধান বা রিপু-প্রধান ভোগাসক্তা স্ত্রীলোকের অথবা কৃত্রিম মৈথুনজনিত ও ঋতু সময় হঠাৎ বেশী ঠাণ্ডা লাগিয়া বাধক জন্মিয়া থাকে।

চিকিৎসা

১। গরম জলের টবে ঋতুর ২।৩ দিন পূর্ব্ব হইতে সপ্তাহ কাল বসাইলে সহজ ভাবে রক্তস্রাব হইয়া নিরাপদ হইবে। এইটি খুব উত্তম ব্যবস্থা।

২। গোলমরিচ ২৫টি ও বিশকাটালির ডগা ৭টী একত্রে ঋতুকালে ৫।৬ দিন খাইলে বাধক বেদনা আরোগ্য হয়।

৩। ওলট কম্বলের শিকড়ের ছাল ।৹ তোলা, গোল-মরিচ ১০টি এক সঙ্গে শীলে বাটিয়া বড়ির মত করিয়া ঋতুর ২।৩ দিন পূর্ব্ব হইতে ঋতু অন্তেও ৪।৫ দিন খাইবে। ২।৩ ঋতু সময়ে এই নিয়মে ব্যবহার করিলেই ঔষধের আশ্চর্য্য ক্ষমতাতে মুগ্ধ হইবে।

রজঃস্তম্ভ বা নষ্ট ঋতু

লক্ষণ—একবার স্ত্রী-ধর্ম্ম প্রকাশ পাইয়া পুনরায় উহা বিলুপ্ত হইলে তাহাকে রজঃস্তম্ভ কহে। রজঃনাশ রোগে রজঃ একেবারেই ক্ষরিত হয় না ; আর রজঃস্তম্ভে রজঃ ক্ষরিত হইয়া জরায়ুগর্ভে সঞ্চিত থাকে। কোন প্রতিবন্ধক বশতঃ বাহির হইতে পারে না। গর্ভ. আলস্য, অতি সংসর্গ, প্রাচীন বা তরুণ রোগ, রক্তক্ষয়, ঋতুকালে বরফ সেবন বা শীতল বায়ু সেবন প্রভৃতি কারণে ঋতুশোণিত স্তম্ভিত হইয়া থাকে। ঋতুকালে অকস্মাৎ এইরূপ রজঃ রোধ হইলে অত্যন্ত যাতনা হয়।

চিকিৎসা

১। নকটকিয়া গাছ, জবাফুল, দূর্ব্বা সমভাবে বাটীয়া কাঁজীর জলের সহিত খাইলে স্ত্রীলোক পুনরায় ঋতুমতী হয়।

২। হনকসা গাছের শিকড় বাটিয়া কাঁজীর জলের সহিত খাইলে স্ত্রীলোক ঋতুমতী হয়

৩। কাঁচা সুপারী সহ পান সর্ব্বদা ব্যবহার করিলে নষ্ট ঋতু পুনরুদ্ধার হয়।

৪। ঝিছরীরপানা পাতিলেবুর রসের সহিত সপ্তাহ কাল খাইলে তল পেটের চাপ ভাঙ্গিয়া নষ্ট ঋতু পুনরায় ভাল হয়।

কুপথ্য

পিয়াজ, রসুন ও উত্তেজক আহার নিষিদ্ধ।

রক্তপ্রদর বা অতিরজঃ রোহিণী

লক্ষণ—সাধারণতঃ স্ত্রীদিগের ২৮ দিনে একবার ঋতু হয়। পরে ৩ হইতে ৫ দিন থাকে এবং রক্ত /৫/• পোয়া /১/• তিন ছটাক স্রাবিত হইয়া থাকে। ইহা অপেক্ষা অধিক রক্তস্রাব হইলে এবং ঋতু এক মাসের ভিতরে পুনঃ পুনঃ হইয়া রক্ত-স্রাব হইলে তাহাকে অতিরজঃস্রাব বলা যায়। শারীরিক রক্তাধিক্য বা দুর্ব্বলতা বা অন্য কোন প্রকার জরায়ুর দোষেও এ রোগ জন্মিতে পারে। অবারিত স্রাবেও রক্তস্রাব হইয়া থাকে, পেটে বেদনা থাকে, জরায়ু কন্ কন্ করে, মাজা উরু এবং পৃষ্ঠদেশ পর্য্যন্ত বেদনা সঞ্চারিত হইয়া থাকে। কখনও বা বেদনা থাকে না, নীরবে স্রোতবেগে রক্তস্রাব হইতে থাকে। এই রক্ত অতিশয় দুর্গন্ধময়; রোগিণী ক্রমে অস্থিচর্ম্মসার হয়। এই রোগ মেয়েদের পক্ষে বড় কঠিন জানিবে।

চিকিৎসা

১। শ্বেত আকন্দের শিকড়ের ছাল ২ তোলা, গোলমরিচ আধ তোলা, বাসি জল দিয়া বাটিয়া ২।৩ দিন খাওয়াইলে রক্তপ্রদর ভাল হয়।

২। চাঁপানটিয়া গাছের শিকড় ২ তোলা, জবাফুলের কুঁড়ি ২টি কাঁজীর জলের সহিত বাটিয়া ২।১ দিন খাইলে রক্ত-প্রদর আরোগ্য হয়।

৩। কালধুতুরা গাছের একখানা শিকড়ের রস চিবাইয়া প্রাতঃকালে স্নানান্তে ভিজা কাপড় ও ভিজা চুলে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে খাইবে। শেষ রাত্রিতে গরম ভাত পাক করিয়া জল দিবে। ঐ জল দেওয়া ভাত গোয়ালার পাতা দধি সহ বিনা লবণে সাধ্যমত খাইবে, এক দিনে রোগ ভাল হইবে। ব্যারাম যত বৎসরের শিকড় ততখানা খাইবে।

৪। গাভীর দুগ্ধ /১০ পোয়া, আম্রকেশী বাটা ১টী, পদ্মফুল ১টী, চাঁপা কলা ১টী, একত্র চটকাইয়া খালি পেটে ২।৩ দিন সেবন করিলে রক্তপ্রদর নিশ্চয় সারিবে।

৫। আফুলা বেলের শিকড় কোমরে বাঁধিয়া রাখিলেও রক্তপ্রদর রোগ ভাল হয়।

৬। ১টি গিলার শাঁস ১৫টি গোলমরিচ সহ বাটিয়া ৩টি বটিকা প্রস্তুত করিবে। ১টি করিয়া বটিকা প্রতিদিন প্রাতে খাইবে, ইহাতে অবিরাম স্রোত রক্তপ্রদর রোগ ভাল হয়।

৭। অশোক ফুল ১ থোক ও দুধরাজের ডগা ২।৩টি একত্রে জল দিয়া বাটিয়া ২।৩ দিন খাওয়াইলে রক্তপ্রদর রোগ অতি অল্প সময়ে নিশ্চয় আরোগ্য হয়।

কুপথ্য

উত্তেজক আহার ও রাত্রি জাগরণ নিষেধ।

শ্বেতপ্রদর

লক্ষণ—এই পীড়ার প্রকৃত কারণ কেহ নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে না। জরায়ু বা যোনির শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির প্রদাহহেতু এক প্রকার তরল পদার্থ নিঃশ্রাব হওয়াকে শ্বেতপ্রদর কহে। দুর্ব্বল, শীর্ণ, রুগ্ন, সুন্দর বর্ণ, কোমল স্বভাব স্ত্রীলোকগণের সচরাচর এই রোগ হইয়া থাকে। কোন বয়সেই এই রোগের হাত হইতে নিস্তার নাই। শীত প্রধান প্রদেশে এই রোগ অধিক হয়। গণ্ডমালা, যোনি-প্রদাহ, জরায়ুর স্থানভ্রষ্ট, সূতিকাবস্থা, গর্ভাবস্থা, ক্রিমি, ক্ষয়কাশ প্রভৃতি রোগের সহিত বা পরে শ্বেতপ্রদর সচরাচর দেখা যায়।

চিকিৎসা

১। দুগ্ধ /১ সের, জবাফুল ৫টি নূতন মাটির হাঁড়িতে সরা চাপা দিয়া মুখ বন্ধ করিয়া রোগিণী ভিজা কাপড় ও ভিজা চুলে খড়ের (ছোন) দ্বারায় জাল দিয়া ক্ষীর করিয়া বাসি পেটে খাইবে, একদিন মাত্র সেবনেই শ্বেতপ্রদর আরোগ্য হইবে।

২। টাটি সুপারী কয়েকটা ২।৩ ফালা করিয়া কাটিয়া /।০ এক পোয়া জলে ১২।১৪ ঘণ্টা ভিজাইয়া উহার কস খুব বাহির হইলে ঐ জল ২।৩ দিন বাসি পেটে সেবন করিলে নিশ্চয় শ্বেতপ্রদর ভাল হইবে।

৩। ভাল জয়ত্রি দিনের মধ্যে ৪।৫ বার পানের সহিত খাইলে সপ্তাহের মধ্যে শ্বেতপ্রদর ভাল হয়।

৪। শীতল জলে কিছু লবণ মিশাইয়া ১ ঘটা পরিমাণ কোমর পর্য্যন্ত ডুবাইয়া বসিয়া থাকিলে শ্বেতপ্রদর ঔষধ বিনাও আরোগ্য হয়। সহিষ্ণু হইয়া দীর্ঘ দিন নিয়ম পালন করা আবশ্যক।

৫। অশোক গাছের ছাল ২ তোলা, /১ একসের জল ও /। এক পোয়া দুধ সহ জ্বাল দিয়া /। এক পোয়া থাকিতে নামাইয়া পান করিলে শ্বেতপ্রদর নিশ্চয় সারিবে।

৬। শিমূলতুলার ফুল সৈন্ধব লবণের সহিত মাখাইয়া ঘৃতে ভাজিয়া খাইলেও ঐ রোগ ভাল হয়।

৭। বিশল্যাকরণীর পাতা বাটিয়া ১ তোলা পরিমাণে দুই বেলা সেবন করিলে অচিরাত নুতন ও পুরাতন প্রদর ভাল হয়।

৮। চাঁপানটিয়া গাছের শিকর দুই তোলা, জবাফুলের কুঁড়ি ২টি একত্র বাটিয়া ২।০ দিন খাইলে শ্বেতপ্রদর ভাল হইবে।

পথ্যাপথ্য

পুষ্টিকর ও সহজ পাচ্য দ্রব্য ভক্ষণ করিবে, উত্তেজক আহার নিষিদ্ধ, অগ্নির জ্বালে যত কম যাইতে পারা যায় ততই ভাল। দিবানিদ্রা ও মৈথুন পরিত্যাগ করিবে।

মৃতবৎসা দোষ

(আরোগ্যের উপায়)

শ্বেত জবা, শ্বেত করবী, শ্বেত শিমুল, শ্বেত আকন্দ ও শ্বেত অপরাজিতা গাছের শিকড় সূর্য্য বা চন্দ্রগ্রহণ কালে উঠাইয়া

রাখিয়া পরে ঐ শিকড় জলের মধ্যে রগড়াইয়া গর্ভিণীকে খাওয়াইলে স্ত্রীলোকের মৃতবৎসা আরোগ্য হয়।

পারদ নিবারণের উপায়

পারদে শরীর পরিপূর্ণ হইলেও একটি সামান্য দ্রব্য দ্বারা শরীরস্থ সমস্ত পারদ নির্গত করা যাইতে পারে। নাটা নামক এক প্রকার কাঁটাযুক্ত বৃক্ষ প্রায়ই পল্লীগ্রামের জঙ্গলে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহার ফলের শাঁস অনেক রোগে ঔষধরূপে ব্যবহার হইয়া থাকে, সেই নাটাগাছের কচি ডগা (অগ্রভাগ) যাহার গাত্রে এখন পর্য্যন্ত কণ্টকাদি জন্মে নাই এবং পত্রাদিও তাদৃশ সতেজ হয় নাই; সেই ডগার অর্দ্ধছটাক পরিমাণ রস বিনা জলে বাহির করিয়া প্রতিদিন সেবন করিলে এক সপ্তাহের মধ্যে শরীরস্থ সমস্ত পারদ নির্গত হইয়া যাইবে।

প্রয়োগ—শরীরে যদি পারদ ব্যবহার জনিত ক্ষত পরিদৃষ্ট হয়, ক্ষত হইতে শোণিত ও পূঁয নির্গত হইতে থাকে, স্থানে স্থানে ফুলা ও তাহার মধ্যে বেদনা অনুভূত হইলে পূর্ব্বোক্ত ঔষধ সেবন ও নিম্নলিখিত ঔষধ ক্ষতস্থানে প্রয়োগ করিবে। ইহাতে অতি অল্প দিনের মধ্যে শরীরস্থ পারদ নির্গত হইবে এবং ক্ষতও শুষ্ক হইয়া যাইবে।

কুক্‌সীমা নামক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষ পল্লীস্থ পতিত জমিতে প্রায়ই উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই কুক্‌সীমার রস নির্গত করিয়া একটি প্রস্তরের বাটিতে রাখিয়া হস্ত দ্বারা বারংবার নাড়িলে তাহা লোহিত বর্ণ ধারণ করিবে, তখন ক্ষতের উপরে প্রয়োগ করিবে। এইরূপ প্রত্যহ নূতন রস নির্গত করিয়া ক্ষতস্থানে ব্যবহার করিবে। সপ্তাহকাল ব্যবহারে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে।

প্রসূতির স্তনে দুগ্ধ বৃদ্ধি হইবার ঔষধ

১। কাপাস তূলা গাছের পাতার রস ১ তোলা ১৫।২০ ফোঁটা মধুসহ প্রাতে ও বৈকালে খাইলে প্রসূতির স্তনে অত্যন্ত দুগ্ধ হইবে।

২। অথবা কাপাসতূলার বীজ অল্প ভাজিয়া চূর্ণ করিয়া পরে 'চা' এর মত গরম জলে সিদ্ধ করিয়া সেই জল দুগ্ধ ও চিনি মিশ্রিত করিয়া খাইলে প্রসূতির স্তনে প্রচুর দুগ্ধ হয়।

চুলকানী বা খাজলীর অব্যর্থ ঔষধ

গোল মরিচ ১ তোলা, ইক্ষুগুড় ১ তোলা, কালজিরা ১ তোলা, থানকুনি পাতার রসের সহিত বাটিয়া তিনটি গুলি (বটিকা) করিয়া তিন দিন খাইতে হইবে। প্রত্যহ ২।৩ বার

করিয়া দাস্ত হইবে। ইহাতে শরীরের খাজনীর চুনক নীর দোষ নষ্ট হইয়া ভাল হইবে। কেবল দুধ ও ভাতই পথ্য।

রাতকাণার ঔষধ

যাহারা রাত্রিতে কম দেখে বা মাত্রও দেখে না তাহাকে রাত কাণা বলে। দধির সহিত কয়েকটি বেলপাতা প্রত্যহ বাটিয়া খাইতে হইবে। কিছুদিন পর্য্যন্ত সেবন করিলে রাতকাণা দোষ ভাল হয়।

হাঁপানীর ঔষধ

শ্বেত বাইরকলি গাছের শিকড় এক কড় পরিমাণ ১। সোয়াটা গোলমরিচ সহ বাটিয়া সেবন করিবে। ৭দিন এই ভাবে সেবনে হাঁপানী ভাল হয়।

কুপথ্য

শাক, টক, বাসি জিনিষ, পুটিমাছ, বোয়াল মাছ খাওয়া নিষেধ।

মৃগী রোগের আশ্চর্য্য ঔষধ

কনকচাঁপা ফুল গাছের পাতার রস এক ছটাক, ইক্ষু চিনি আধ তোলার সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রাতে খাইবে এবং বৈকালে

অর্দ্ধ ছটাক রস।• চারি আনা ইক্ষু চিনি সহ সেবন করিলে কিছু দিন মধ্যে রোগ ভাল হইবে। কাহার কত দিন খাইতে হইবে তাহা ঠিক বলা যায় না। ২১ দিন প্রত্যেক রোগীকেই খাইতে হয়। অধিক দিনের রোগীর ৪• দিন সেবন করিতে হয়।

কুপথ্য

ঔষধ সেবন কাল পর্য্যন্ত শাক, টক, বাসি জিনিষ খাওয়া নিষিদ্ধ।

মাথাধরার আশ্চর্য্য ঔষধ

চোকপনী মাছ (চক্ষুদানী মাছও বলে) এই মাছ পুকুরের ও ডোবার কিনারায় ভাসিয়া বেড়ায়, বেশী সময় জলের নীচে থাকিতে পারে না। মাছটা ১৷৷০ ইঞ্চি কি ২ ইঞ্চি লম্বা হয়। সেই মাছের মাথার উপর একখানা পোকরাজ পাথরের মত বস্তু আছে, তাই সর্ব্বদা চক চক করে। ইহার একটি মাছ ধরিয়া বীচি রহিত এক টুকরা কলার মধ্যে ভরিয়া প্রাতে খালি পেটে একদিন রোগীকে খাইতে দিবে। আধকপালি মাথাধরা নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। মাত্র একদিন ঔষধ খাইলে চির-জীবনে আর মাথাধরার কষ্ট পাইতে দেখা যায় না।

ক্রিমির বেদনা আরোগ্যের উপায়

ক্রিমির বেদনা বিশেষ কষ্টদায়ক রোগ। এমন কি এই রোগে হঠাৎ মারাও যায়। অতএব ক্রিমির বেদনা উপস্থিত হইলে একটি কাঠালি কলা বীচি-শূন্য করিয়া ২।৩ তোলা ইক্ষু গুড়ের সহিত চটকাইয়া রোগীকে খাইতে দিবে। ইহাতে ৫।৭ মিনিটের মধ্যে ক্রিমির বেদনার উপশম হইবে। অনেকে মনে করিতে পারে গুড়ে আর কলায় ক্রিমি বৃদ্ধি করে, অতএব ক্রিমির বেদনা উপস্থিত হইলে তাহা খাওয়াইলে আরও রোগের বৃদ্ধি হইবে। কিন্তু তাহা হইবে না, কারণ গুড় ও কলা খাইবার জন্য ক্রিমিগুলি নীচের দিকে নামিয়া যাইবে ও বেদনার উপসম হইবে।

বিশেষ বিধি

ঔষধ উত্তোলন ও সেবন দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাস-বহন সময় করিতে হইবে। গাছগাছড়ার ঔষধ দিনের বেলায় তুলিতে হয়। জলের মধ্যের গাছগাছড়া রাত্রিতে তুলিলে বিশেষ কার্য্যকারী হয়। যখন তখন গাছগাছড়া ঔষধ তুলিলে ঔষধের বীর্য্য নষ্ট হয়, ফলও ভাল হয় না।

পঞ্চামরা

পাঁচটী অমর জিনিষের দ্বারা এই পঞ্চামরা তৈয়ার হয় বলিয়া ইহাকে পঞ্চামরা বলে। এই পঞ্চামরা বিধিমত তৈয়ারী

করিয়া খাইলে শ্বাস, কাশ, শূল, অম্লপিত্ত গ্রহণী ও বহুমূত্রাদি উৎকট নানা পীড়া আরোগ্য হয়। পঞ্চামরা ভক্ষণ করিলে সাধক স্থিরচেতা হয়। সাধন অবস্থায়ও এই পঞ্চামরা বিশেষ উপকারী। যাহারা বহুমূত্রাদি উৎকট রোগে ভুগিতেছেন বা নানারূপ চিকিৎসায় বিফলমনোরথ হইয়া জীবনের আশা ত্যাগ করিয়াছেন তাঁহারা এই পঞ্চামরা তৈয়ারী করিয়া কিছুদিন সেবন করিলে ইহার আশ্চর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইবেন।

একাতু অমরা দূর্ব্বা তস্যা গ্রন্থিং সমানয়েৎ।
অন্যাতু বিজয়া দেবী সিদ্ধি রূপা সরস্বতী।
অন্যাতু বিল্বপত্রস্থা শিব-সন্তোষকারিণী—
অন্যাতু যোগসিদ্ধার্থে নিগুণ্ডী চামরা মতা।
অন্যাতু কালতুলসী শ্রীবিষ্ণোঃ প্রিয়তোষিণী
এতাঃ পঞ্চামরাজ্ঞেয়া যোগসাধন কর্ম্মণি।

(যোগরসায়ন ৩য় ভাগ।)

পাঁচটা অমর জিনিষ কি ?

দূর্ব্বার গ্রন্থি (গাঁইট) ও সিদ্ধি (ভাঙ্গ), বিল্বপত্র, কাল তুলসী, নিসিন্দা, এই পাঁচটি জিনিষকে অমর বলিবার কারণ কি ? এই পাঁচটি জিনিষ ১০ বৎসর শুকাইয়া রাখিলেও ইহার শক্তি নষ্ট হয় না. এই জন্যই এই পাঁচটি জিনিষকে অমর বলিয়াছেন। অন্যান্য গাছগাছড়া ঔষধ শুকাইয়া রাখিলে ১ বৎসরের বেশী তাহার গুণ থাকে না।

পঞ্চামরা তৈয়ারীর বিধান

১। দূর্ব্বার পাতা লইবে না, কেবল গ্রন্থিগুলিই ছিড়িয়া লইবে। তৎপর ভালভাবে শুকাইয়া চূর্ণ করিয়া লইবে।

২। সিদ্ধি (ভাঙ্গ) বাজারে কিনিতে পাওয়া যায়। সিদ্ধি, দুগ্ধ ও জলে মিশ্রিত করিয়া জ্বাল দিবে এবং যখন জলটা বেশ ফুটিয়া উঠিবে তখন নামাইয়া সিদ্ধিগুলি ছাকিয়া নিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া ভালভাবে চূর্ণ করিয়া নিতে হইবে।

৩। বেলপাতার শিরগুলি ফেলিয়া দিয়া শুধু পাতাগুলি লইয়া রৌদ্রে শুকাইয়া চূর্ণ করিয়া লইতে হইবে।

৪। কালতুলসীর শুধু পাতাগুলি লইয়া রৌদ্রে শুকাইয়া চূর্ণ করিয়া লইবে।

৫। নিসিন্দার পাতাগুলি রৌদ্রে শুকাইয়া চূর্ণ করিয়া লইতে হইবে।

এই পাঁচটি জিনিষ পৃথক পৃথক ভাবে চূর্ণ করিয়া পরে শোধন যন্ত্র দ্বারা গুড়াগুলি পৃথক ভাবে শোধন করিয়া লইতে হইবে।

শোধন মন্ত্র

দূর্ব্বা শোধন—ওঁ হরে অমরপুষ্টে ত্বমমৃতোদ্ভব সম্ভবে। অমরং মাং সদাভদ্রে কুরুষ ত্বং হরিপ্রিয়ে। ওঁ দূর্ব্বায়ৈ স্বাহা।

সিদ্ধি শোধন—ওঁ অমৃতে অমৃতোদ্ভবে অমৃতবর্ষিণী অমৃত-মাকর্ষয় সিদ্ধিং দেহি সর্ব্বং বশমানয় স্বাহা।

বিল্বপত্র শোধন—ওঁ কায়সিদ্ধি করে দেবি বিল্বপত্র নিবাসিনি অমরত্বং সদা দেহি শিবতুল্য কুরুষ মে। ওঁ শিবদায়ৈ নমঃ স্বাহা।

নিসিন্ধা শোধন—ওঁ নির্গুণ্ডী পরমেশানি যোগোনা-মধি দেবতে। সমাং রক্ষতু অমরে ভাবসিদ্ধি প্রদে নমঃ ওঁ শোকাপহায়ৈ নমঃ স্বাহা।

তুলসী শোধন—ওঁ বিষ্ণোঃ প্রিয়ে মহামায়ে কাল জাল নিবাশিনী। তুলসী মাং সদারক্ষ মামেকমমরং কুরু। ওঁ হ্রীং শ্রীং ঐং হ্রীং অমরায়ৈ নমঃ স্বাহা।

অনন্তের ভিন্ন ভিন্ন শিশিতে গুড়াগুলি রাখিয়া দিবে। তৎপর বিলপত্রাদি চারি দ্রব্য সমপরিমাণ লইবে। আর চারি দ্রব্য একত্রে যে পরিমাণ হয় তাহার দ্বিগুণ সিদ্ধি মিশাইয়া আবার সিদ্ধি শোধন মন্ত্রে শোধন করিয়া লইবে।

পরে ধেনু, মৎস্য ও যোনিমুদ্রা প্রদর্শন করিয়া তত্ত্বমুদ্রা দ্বারা গুরুর নামে মস্তকে ৭বার তর্পণ করিবে। পরে বীজমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক ইষ্টদেবতার নাম করিয়া "তর্পায়ামি নাম নমঃ" বলিয়া ৭ বার তর্পণ করিবে। পরে ওঁ বদ বদ সর্ব্বসত্ত্ব বশঙ্করী শঙ্করকণ্ঠ "ত্রিশূলিনী স্বাহা" বলিয়া ভক্ষণ করিবে।

গুড়া ঔষধ সেবনের চেয়ে ঐ গুড়া শীলে সামান্য জল দিয়া খুব ভালভাবে বাটিয়া সেবন করিলে বিশেষ ভাল ফল পাওয়া

যাইবে। প্রত্যহ এক আনা ওজনে খাইতে আরম্ভ করিবে। ক্রমান্বয়ে মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া লইলে ভাল হইবে। যাহাতে সামান্য একটু নেশার ভাব আসে সেই মাত্রায় খাইতে হইবে। অতিরিক্ত নেশা হইলে শরীর খারাপ হইবে। শরীরের অবস্থা ও ধাতু গতি বুঝিয়া কম বেশী মাত্রা ঠিক করিবে।

যদি কেহ একান্তপক্ষে মন্ত্রাদি দ্বারা শোধন না করিতে পারে তবে সাধারণ ভাবে তৈয়ার করিয়া খাইবে, তাহাতেও ফল পাওয়া যাইবে।

শিবযোগ ও সিদ্ধি একবীর তন্ত্র গুহ্যযোগ এবং আচারসার ও যোগরসায়ন প্রভৃতি গ্রন্থে ঐ পঞ্চামরার বহুবিধ ফল বর্ণিত হইয়াছে।

পঞ্চামরা ভক্ষণের অমরো যোগ সিদ্ধিভাগ

(সিদ্ধিযোগ)

এই পঞ্চামরা ব্যবহারে বড় কঠিন রোগী আরোগ্য হইয়াছে। যে মহাত্মার নিকট এই পঞ্চামরার প্রণালী শিক্ষা করি, তিনি নিজে তৈয়ার করিয়া দিয়া বহুমূত্র, গ্রহণী, অম্লপিত্ত ও শূল আরোগ্য করিয়াছেন।

গোচিকিৎসা

হিন্দু-শাস্ত্রকারগণ গোজাতিকে দেবতার আসনে স্থান দিয়াছেন। তাঁহাদের মতে গাভী মাতৃস্থানীয়। তাহার দেহে ৩৩ তেত্রিশ কোটি দেবতার বাস এবং একমাত্র গোসেবা দ্বারাই জীবের ধর্ম্ম, অর্থ, কাম মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গের ফল লাভ হয়।

যাহার যাহাই কাম্যবস্তু হউক না কেন, তাহা লাভ করিতে হইলে জীবন রক্ষা যে সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন, এ কথা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিতে হইবে। কিসে আমাদের জীবন রক্ষা হয়? মাতৃগর্ভে জীবের সঞ্চার হওয়া অবধি মঙ্গলময় পরমেশ্বর মাতৃস্তনে খাদ্যের সংস্থান করিয়া রাখিয়াছেন বটে, কিন্তু ইহা বোধ হয় সকলেরই জানা আছে যে, শিশুর কেবল মাতৃস্তন্য দ্বারা জীবন রক্ষা হয় না। ৩।৪ দিন পর্য্যন্ত গো-দুগ্ধই সেই নবজাত শিশুর জীবন রক্ষার একমাত্র উপায়। কারণ ৩।৪ দিন পর্য্যন্ত মাতৃস্তনের দুগ্ধ এক রকম ঘন আঠাবৎ থাকে ও অতি সামান্য পরিমাণে বাহির হয়, তাহা দ্বারা শিশুর জীবন রক্ষা হইতে পারে না। শিশুও স্তন টানিয়া খাইতে পারে না। এই গো-দুগ্ধ পান করিয়াই শিশু দিন দিন বাড়িয়া উঠে। গো-দুগ্ধ রোগীর পথ্য, দুর্ব্বলের বল, বৃদ্ধের জীবন, এমন

কি মৃত্যুশয্যায় শায়িত মুমূর্ষু ব্যক্তির যখন আহার্য্য বস্তু গিলিবার শক্তি লোপ হইয়া আসিতে থাকে, তখন গো-দুগ্ধই তাহার মৃতপ্রাণে অন্ততঃ কতক সময়ের জন্য সঞ্জীবনী শক্তি ঢালিয়া দেয়।

দধি, ঘৃত, ননী, ছানা এবং অন্যান্য যতপ্রকার উপাদেয় ও পুষ্টিকর খাদ্য আমরা সচরাচর খাইয়া থাকি, অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, তাহাদের অধিকাংশই গো-দুগ্ধ হইতে প্রস্তুত।

জীবনরক্ষার যাবতীয় উপাদান একমাত্র দুগ্ধ হইতে হইয়া থাকে। কোন বস্তু আহার না করিলেও একমাত্র দুগ্ধ পান করিয়াই আমরা সুস্থদেহে জীবন যাপন করিতে পারি।

স্থিরভাবে চিন্তা করিলে দেখা যায়, মানব সমাজে গো-জাতির উপকারিতা একমাত্র দুগ্ধেই পর্য্যবসিত হয় নাই। চাষে ও অন্যান্য কার্য্যে গরু আমাদের নিত্য সহচর। গরু কৃষকের একমাত্র সম্পদ; সুতরাং জীবনরক্ষার উপযোগী কৃষিলব্ধ যাবতীয় উপকরণের জন্যই এই গোজাতির নিকট আমরা চির-ঋণে আবদ্ধ। এই কথা একবাক্যে সকলেই স্বীকার করিতে হইবে।

ব্যবসায় বাণিজ্যের হিসাবেও গোজাতির উপকারিতা কম নহে। জুতা, চিরুণী, ছাতার বাট, চামড়া প্রভৃতি যে সমস্ত জিনিষ সর্ব্বদা আমরা ব্যবহার করিয়া থাকি, তাহার অধিকাংশই গরুর

চামড়া, অস্থি, শৃঙ্গ, খুড় এবং পুচ্ছ হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকে। গোময় জ্বালানী কাষ্ঠরূপে ও জমিতে সাররূপে নিত্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

আর দেখা যায় চিকিৎসাক্ষেত্রেও ইহার উপকারিতা কম নহে। প্লীহা ও যকৃতের রোগীর পক্ষে গো-মূত্র পান ও গো-মূত্রের শেক গ্রহণ পরম হিতকর। প্রস্রাবের পীড়া, চক্ষুঃরোগ-দোষ, উদারাময়, বাত, গুল্ম, কুণ্ডু প্রভৃতি রোগ দূর করিতেও ইহার ক্ষমতা অসীম। এতদ্ভিন্ন গো-মূত্রে আরও বহুরোগ নিবারক গুণ বর্ত্তমান আছে বলিয়া আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রকারগণ উচ্চ কণ্ঠে ইহার প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন।

হিন্দুদের সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে অনুধাবন করিলে দেখিতে পাই, নিত্য নৈমত্তিক যাবতীয় কার্য্যেই তাহাদিগকে গো-জাতির সহায়তা গ্রহণ করিতে হয়। হিন্দুর ঘরে গোবর না হইলে একদণ্ড চলে না। দুর্গন্ধনাশক ও বিশুদ্ধকারক বলিয়া হিন্দুরমণীগণ প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিয়া সর্ব্বাগ্রে সমস্ত বাড়ীতে গোময় ছড়া না দিয়া অন্য কোন কাজ করে না।

এইক্ষণ আমরা মোটামুটি এই বুঝিলাম, ভূমিষ্ঠ হওয়া অবধি জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত জীবন-রক্ষা ও ধর্ম্ম অর্থ প্রভৃতি সংসারের যাবতীয় ভোগ্য ও কাম্যবস্তু লাভ করিতে হইলে একমাত্র গো-জাতির উপরেই আমাদের সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে হয়। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় এরূপ উপকারী

গো-জাতির প্রতি আমরা এইরূপ নানাপ্রকার অনাদর প্রদর্শন করিয়া আসিতেছি।

বর্ত্তমানে গোহত্যা ও গোচারণ ভূমির অভাবে গো-জাতির সংখ্যা হ্রাসের কারণ অনেকে নির্দ্দেশ করিতেছেন। কিন্তু অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে এই দুইটীই একমাত্র কারণ নহে। অচিকিৎসা এবং কুচিকিৎসাও তাহাদের সংখ্যা হ্রাসের প্রধান কারণ। আমরা গো-জাতির চিকিৎসা বিষয়ে এত উদাসীন যে, উহার চিকিৎসা হওয়া যে ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ উচিত তাহা মনে করি না। গো-জাতি বোবা, তাহারা মুখ ফুটিয়া কোন কথা বলিতে পারে না, কেবলমাত্র বাহ্যিক লক্ষণ দৃষ্টে রোগনির্ণয় ও ঔষধ নির্ব্বাচন করিতে হয়। এমতাবস্থায় গো-জাতির চিকিৎসা যে বিশেষ বিবেচনাধীন তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন।

পূর্ব্বকালে আর্য্য ঋষিগণের কথা ছেড়ে দেন, বর্ত্তমানে সুসভ্য ইংরাজ রাজ্যে গো-হত্যা সত্ত্বেও তাঁহারা গো-জাতির রক্ষার ও শ্রীবৃদ্ধির জন্য কতরূপ যত্ন চেষ্টা করিতেছেন তাহা কে না জানেন?

যাহা হউক আমার বক্তব্য এই যে, যাহাতে বিনা চিকিৎসায় এই গো-জাতি অকালে মারা না যাইতে পারে তদ্বিষয়ে আমাদের সকলেরই দৃষ্টি রাখা বিশেষ প্রয়োজন। সহৃদয় গভর্ণমেণ্ট ভিন্ন ভিন্ন স্থানে দাতব্য পশু-চিকিসালয় স্থাপন করিয়াছেন সত্য, কিন্তু চিকিৎসালয়ের সংখ্যা নিতান্ত কম

বলিয়া অভাব সম্পূর্ণ পূরণ হইতেছে না। উক্ত অভাব দূরীকরণার্থে সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য অতি সরল ভাষায় এবং অতি সহজ চিকিৎসা সম্বন্ধে যত রকম তথ্য মহাত্মাদের নিকট সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহাই সন্নিবেশিত করিলাম। যাঁহারা সামান্য লেখাপড়া জানেন তাঁহারাও মনোযোগ সহকারে এই পুস্তকের লিখামত চিকিৎসা কার্য্য পরিচালনা করিলে সর্ব্বত্রই সফলকাম হইতে পারিবেন। এই বিষয়ে আমি স্পর্দ্ধার সহিত বলিতে পারি।

দেশবাসীগণের নিকট আমার বিশেষ অনুরোধ, তাঁহারা এই চিকিৎসা প্রণালী অবলম্বন করিয়া গো-জাতিকে ধ্বংসের মুখ হইতে রক্ষা করিয়া দেশের কল্যাণ সাধন ও কৃপালাভ করুন।

গাভীর দুগ্ধ বৃদ্ধি হইবার উপায়

যে সমস্ত প্রণালী অবলম্বন করিলে দুগ্ধবতী গাভীর দুগ্ধ প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পায় তাহা বোধ হয় অনেকেই জানেন না। আমি নিম্নে তাহার কয়েকটী লিখিয়া দিলাম।

১। পদ্মপত্র এবং তিল /০ এক পোয়া পরিমাণ একত্র করিয়া গাভীকে সপ্তাহ কাল খাওয়াইলে গরুর দুগ্ধ বৃদ্ধি পায়।

২। কচি বেল ও কাটানটিয়ার শাক, মাশকলাই সহ সিদ্ধ করিয়া খাওয়াইলে গরুর দুগ্ধ অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়।

৩। মাসকলাই ও লাউ একত্র সিদ্ধ করিয়া গাভীকে কয়েকদিন খাওয়াইলে গাভীর দুগ্ধ বৃদ্ধি হইবে।

৪। কুহিৎ মৎস্যের একটা তৈল (নাড়ীভূড়ী পিত্তাদি) কোনরূপ মসলা ও লবনাদি না দিয়া অগ্নিতাপে ভাজিয়া তাহা সমান তিন ভাগ করিয়া প্রত্যহ প্রাতে এক এক ভাগ কলা পাতা দিয়া জড়াইয়া গাভীকে তিন দিন তিন ভাগ খাওয়াইতে হইবে এবং যে দিন খাওয়াইবে সেই দিন হইতে ২১ দিন পর্য্যন্ত প্রত্যহ দ্বিপ্রহরে গাভীটাকে নদীতে অথবা পুকুরে নামাইয়া রীতিমত স্নান করাইবে

এই ঔষধ সেবন করাইলে গাভীর ক্ষুধা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বৃদ্ধি পাইবে। তখন গাভী যতই খাইতে চায় ততই খাইতে দিবে। কিন্তু খড়াদি শুক্না ঘাস না দিয়া কাঁচা ঘাস ও তরল খাদ্য দিতে হইবে। চাউল ধোয়া জল, ডাল ধোয়া জল কিংবা ভাতের মাড় এবং ৵৷০ এক পোয়া পরিমাণ চাউল ও ৵৷০ এক পোয়া কাঁচা মাসকলাই উত্তমরূপে সিদ্ধ করিয়া এক ছটাক লবণ সহ প্রত্যহ প্রাতে একবার সন্ধ্যায় একবার মাত্র দিতে হইবে। আর দ্বিপ্রহরে একবার কাঁচা ঘাস দিতে হইবে। এই নির্দ্ধারিত সময় ভিন্ন অন্য কোন সময়ে আর কোনও খাদ্য দিবে না।

মন্তব্য—এইরূপ ভাবে ঔষধ তিন দিন খাওয়াইবে। স্নান ২১ দিন করাইবে, কিন্তু পথ্য যে সময় পর্য্যন্ত দুগ্ধ না পাওয়া যায় সেই পর্য্যন্ত এই নিয়ম চালাইতে হইবে। এই

ঔষধ খাওয়াইলে যে কোন রোগ থাকুক না কেন তাহাও সারিয়া যাইবে এবং গাভীটি হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ হইবে।

৫। প্রসবের ১৫।১৬ দিন পর হইতে মাসকলাই অর্দ্ধসের ও চাউল ⁄॥০ সের একত্রে উত্তমরূপে সিদ্ধ করিয়া তাহাতে লালিগুড় (চিটাগুড়) ⁄।০ এক পোয়া, লবণ ⁄⁄০ এক ছটাক ও পিপুল চুর্ণ ১ তোলা মিশাইয়া ভাতের মাড়ের সহিত কিম্বা গরম জলের সহিত প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে গাভীকে খাওয়াইলে প্রচুর পরিমাণে দুগ্ধ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এই সঙ্গে ভাতের মাড় এবং গরম জল যতই বেশী খাওয়াইতে পারিবে ততই দুগ্ধ বেশী হইবে, ঠাণ্ডা জল কখনও খাইতে দিবে না। আর এই সকল খাদ্য কিম্বা কাঁচা ঘাস আদি যে কোন খাদ্যই দেওয়া হয় না কেন, প্রত্যহ ঠিক এক মাত্রায় ও এক সময়ে দিতে হইবে। একদিন কম ও একদিন বেশী, একদিন দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে আর একদিন দুই ঘণ্টা পরে যেন দেওয়া না হয়।

৬। প্রত্যহ দ্বিপ্রহরে ⁄।০ এক পোয়া বুটের ছাতু ও ⁄৵০ আধ পোয়া গুড় ⁄১ সের জলে মিশাইয়া খাওয়াইলে দুগ্ধ প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

দীর্ঘকাল দুগ্ধ টাটকা রাখিবার উপায়

১। দুগ্ধ টাটকা রাখিতে হইলে দুগ্ধে কিঞ্চিৎ জলমিশাইয়া দুগ্ধ পাত্র মৃদু অগ্নি জ্বালে রাখিয়া দিলে দুগ্ধ ২৪ ঘণ্টা টাটকা থাকিবে।

২। বোরাসিক এসিড (Boracic Acid) সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া কিঞ্চিৎ মাত্রায় দুগ্ধে মিশাইয়া রাখিলে ২।৩ দিন পর্য্যন্ত দুগ্ধ খারাপ হয় না অথচ দুগ্ধের গুণের বা আস্বাদনের কোন তফাৎ হইবে না।

দুগ্ধপরীক্ষার সহজ উপায়

একটি পাত্রে কিছু দুধ লইয়া একটি বড় সূঁচ ঐ দুধে প্রবেশ করাইয়া দিবে। যদি ঐ সূঁচের অগ্রভাগে কিছু দুধ লাগিয়া থাকে তবে মনে করিতে হইবে দুগ্ধ খাঁটি, তাহা না হইলে দুধে জল মিশান আছে বুঝিতে হইবে।

১। একটি কাঁচের গ্লাসে খানিকটা দুধ ঢালিবে এবং এই দুধের মধ্যে যদি দৃষ্টি না চলে (অর্থাৎ তৎপর পিঠে না দেখা যায়) সাদা রং দেখা যায় এবং গ্লাসের তলায় তলানি না পড়ে, তবে খাঁটী দুগ্ধ মনে করিতে হইবে।

গাভীর দুগ্ধ সর্প যাহাতে না খাইতে পারে তাহার উপায়

১। শ্বেত জবার একটি ডাল ও একটি বেলের ডাল একত্র করিয়া গোয়ালঘরের চারি কোনে পুতিয়া রাখিলে সেই ঘরে আর সর্প যাইবে না ও দুগ্ধও খাইতে পারিবে না। শ্বেত জবার ও বেলের উভয়ের শিকড় একত্র করিয়া গোয়াল ঘরের চারি কোণে ঝুলাইয়া রাখিলেও সেই ঘরে সর্প আসিবে না।

২। দুই ফোঁটা কার্ব্বলিক এসিড ১০ ফোঁটা নারিকেল তৈলের সহিত মিশাইয়া গাভীর বাঁটে সন্ধ্যার সময়ে লাগাইয়া দিলেও আর সর্পে দুগ্ধ খাইতে পারিবে না।

কোন্ কোন্ গাভীর দুগ্ধ হিতকর ?

১। সুস্থকায়, সবল ও স্বচ্ছন্দে বিচরণশীল কাল রং অথবা লাল রংএর গাভীর দুগ্ধ পান করা হিতকর। বৃদ্ধা, বালবৎসা ও মৃতবৎসা গাভীর দুগ্ধ পান করা অহিতকর।

২। গাভী ও বৎসের রং এক হইলে সেই গাভীর দুগ্ধ বেশী উপকারী। প্রসব করার ১৫ দিনের মধ্যে দুগ্ধ খাওয়া অনুচিত।

৩। রুগ্না গাভীর দুগ্ধ স্বাস্থ্যের পক্ষে অতি অনিষ্টকর। গাভীর গর্ভ ৩ মাসের হইলে আর তাহার দুগ্ধ পান করা উচিত নয়।

— —

গরু বিষ ভক্ষণ করিলে আরোগ্যের উপায়

গরু বিষ ভক্ষণ করিলে তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিকার না হইলে অবস্থা বড় গুরুতর হইয়া দাঁড়ায়। শুনা যায় আমাদের দেশের মুচিরা চর্ম্মের আশায় ঘাসের উপর বা মাঠে দারমুজ (সেকো-বিষ), কাঠ-বিষ, কুচিলা প্রভৃতি বিষাক্ত জিনিষ দিয়া গরুর প্রাণনাশ করিয়া থাকে।

লক্ষণ—গরু বিষ ভক্ষণ করিলে মুখ দিয়া লালা (ফেনার মত) পড়িতে থাকে। কিছু আহার করিতে দিলে খায় না। সর্ব্বশরীর কাঁপিতে থাকে, তলপেটে ব্যথা হয়, লোমের গোড়া শিথিল হইয়া পড়ে, পশ্চাৎদিকের পা ও শৃঙ্গ দিয়া পেটে গুঁতা মারে, অত্যন্ত পিপাসিত হয়, সর্ব্বদা লাদে এবং ধনুষ্টঙ্কারের মত খিচুনী হয়।

চিকিৎসা

শুণ্ঠি চূর্ণ ১।০ সোয়া তোলা, মসিনার তৈল ।০ এক পোয়া ও গন্ধক চূর্ণ ৵০ আধ পোয়া একত্রে ॥০ অর্দ্ধ সের

ভাতের মাড়ের সহিত মিশাইয়া খাওয়াইবে। গরু যে কোন প্রকারের বিষ সেবন করুক না কেন ইহাতেই নিশ্চয়ই সারিবে।

পথ্য

অল্প পরিমাণ কলাই সিদ্ধ করিয়া ভাতের মাড়ের সহিত খাইতে দিবে কিম্বা কেবল গরম ভাতের মাড় খাইতে দিবে। যে পর্য্যন্ত পেট নাবে ও পেটে বেদনা থাকে সে পর্য্যন্ত জল পান করিতে দিবে না।

গলাফুলা আরোগ্যের উপায়

গরুর গলাফুলা রোগ অত্যন্ত ভীতিপ্রদ। আশু প্রতিকার না করিলে কফের প্রকোপ খুব বেশী হইয়া মারা যায়।

লক্ষণঃ—ক্ষুধা কমিয়া যায়, গাত্রের লোম সকল খাড়া হইয়া উঠে, নাক মুখ শুষ্ক দেখায়, কোষ্ঠকাঠিন্য হয়, মাথা, গলকম্বল ও জিহ্বা অত্যন্ত ফুলিয়া যায়। ক্রমে কণ্ঠনালী স্ফীত হয়, পেটে অসহ্য যন্ত্রণা হইতে থাকে এবং শ্বাস বন্ধ হইয়া যায়। মুখ দিয়া অবিরত লালা ঝরে, নাসারন্ধ্র ও চক্ষুর পর্দ্দা লাল হইয়া উঠে, গলার মধ্যে ঘড়ঘড়ানি শব্দ আরম্ভ হয় এবং জিহ্বা রক্তবর্ণ হইয়া ঝুলিয়া পড়ে।

চিকিৎসা

দিনে ১২।১৪ বার স্ফীত স্থানে গরম জলের সেক দিয়া শুষ্ক কাপড় দ্বারা ভালরূপে মুছিয়া তার্পিণ তৈল মালিস করিবে এবং গরম কাপড় দ্বারা স্ফীত স্থানটি বাঁধিয়া রাখিবে। শ্বাস বন্ধ হওয়ার উপক্রম হইলে উত্তপ্ত লৌহদ্বারা স্ফীত স্থানের ২ ইঞ্চি অন্তর ৩।৪টি দাগ করিয়া দিবে। পরে প্রত্যেকটি দাগের উপর তার্পিণ তৈল দিতে হইবে। জলের পরিবর্ত্তে ভাতের মাড় পান করিতে দিবে। /৩০ পোয়া পরিমাণ ভাতের মাড়ের সহিত ৴১০ অর্দ্ধ ছটাক শুট চূর্ণ, গোলমরিচ চূর্ণ ১ তোলা এবং দেশী মদ /॥০ অর্দ্ধ সের মিশাইয়া খাইতে দিলে খুব ভাল ফল পাওয়া যায়।

২। গরু অথবা মহিষের গলায় মরা কুকুরের একখণ্ড হাড় বাঁধিয়া দিলে, গরু মহিষের গলাফুলা রোগ কোন কালে হইবে না। ঐ রোগ হইলেও কুকুরের হাড় গলায় বাঁধিয়া দিলে বিনা ঔষধেই গরু ও মহিষের ফুলারোগ ভাল হইয়া থাকে।

দুগ্ধবতী গাভীর লক্ষণ

কাল এবং ধার বাঁট লক্ষণ বিশিষ্ট গাভী অধিক পরিমাণে দুগ্ধ দেয়। সরু গলা, বক্র এবং সরু শিং, সামনের অথবা

পিছনের পা অপেক্ষাকৃত অল্প বড়, দীর্ঘ পুচ্ছ, সূক্ষ্ম লোম, চর্ম্ম পাতলা ও পিছন ভারী লক্ষণ বিশিষ্ট গাভী অধিক পরিমাণে দুগ্ধ দেয়। গাভী বেশী বয়সে গর্ভিণী না হইলে দুগ্ধ বেশী দেয় না।

গরুর খরুয়া রোগ আরোগ্যের উপায়

গরুর পক্ষে ইহা একটি কষ্টদায়ক রোগ। ইহা গরুর মুখে পায়ে ও বলানে হয়। ইহা হইলে ক্রমে ক্রমে পালে ছড়াইয়া পড়ে

লক্ষণ—ব্যারাম হইবার পূর্ব্বে গরুর ক্ষুধা কম হয়, অলসতা হয় এবং মাঝে মাঝে কম্প হয় ও জ্বর হয়, মুখ দিয়া সর্ব্বদা লালা বাহির হয়। মুখে, পায়ে ও বলানে মটর কলায়ের মত গোটা (ফোস্কা) বাহির হয়। প্রধানতঃ জিহ্বার উপরে এই ফোস্কা দেখা দেয়। পরে শরীরের অন্য জায়গায় হয়, মুখ বেদনা হয় এবং মুখ বন্ধ করিয়া রাখে। যখন এই ফোস্কা ফাটিয়া যায় তখন ঘা লাল বর্ণ দেখায়। অনেক সময় এই ঘায়ে পোকা হইয়া থাকে। পায়ের খুরের ভিতর ঘা হয় এবং ঘা হইলে গরু হাঁটিতে পারে না।

চিকিৎসা

উপযুক্ত চিকিৎসা না করিলে শতকরা ৫ হইতে ৫০ পর্য্যন্ত পূর্ণ বয়স্ক গরু এবং ৫০ হইতে ৮০ পর্য্যন্ত বাছুর মরিয়া থাকে।

গোয়াইল (গরুঘর) হইতে গরুকে কিছু দূরবর্ত্তী স্থানে পরিস্কৃত ও শুষ্ক জায়গায় রাখিতে হইবে। জ্বর বেশী হইলে কর্পূর ⊌০ আনা, সোরা ১ তোলা, দেশী মদ //০ এক ছটাক ও জল /॥০ সের একত্র মিশাইয়া খাইতে দিবে।

মুখের ভিতর ঘা হইলে ফিটকারী ১।০ সোয়া তোলা, গরম জল /।৵০ আড়াই পোয়া, একত্রে মিশাইয়া প্রতিদিন প্রাতে, দ্বিপ্রহরে ও বৈকালে মুখ ধোয়াইয়া দিতে হইবে।

পায়ে খুরের ভিতর ঘা হইলে ফিনাইল ও জল একত্র মিশাইয়া প্রত্যহ প্রাতে, দ্বিপ্রহরে ও বৈকালে ক্ষতস্থান পরিস্কার করিয়া দিতে হইবে। নিমপাতা সিদ্ধ করিয়া সেই জল দ্বারা ধোয়াইলেও হয়। পায়ের ঘায়ে পোকা হইলে আলকাতরা ৪ চারি ভাগ ও তার্পিণ তৈল একভাগ মিশাইয়া ঘায়ে দিতে হইবে। অথবা ফিনাইল এক তোলা ও তার্পিণ তৈল ॥০ অর্দ্ধ তোলা মিশাইয়া ঘায়ে দিলেও পোকা মরিয়া যাইবে।

গোয়াল ঘরে ফিনাইল অথবা কার্ব্বলিক এসিড জলে মিশাইয়া ছিটাইয়া দিবে।

পথ্য

গরুকে কচি দূর্ব্বাঘাস অথবা নরম টাটকা পথ্য খাইতে দিবে। ভাতের মাড় পুনঃ পুনঃ পান করিতে দিবে। ভাতের মাড়ের সহিত চিটাগুড় ও লবণ মিশাইয়া খাইতে দিলেও ভাল হয়। পীড়িত গরুর পরিত্যক্ত খাদ্য অন্য গরুকে খাইতে দিবে না এবং সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত সেই গাভীর দুগ্ধ পান করিবে না এবং বাছুরকেও পান করিতে দিবে না। ইহা পান করিলে বাছুরের নিশ্চয় এই রোগ হইবে।

ক্ষিপ্ত কুকুর কিংবা শৃগাল দংশন আরোগ্যের উপায়

ক্ষেপা কুকুর কিংবা শৃগালের বিষ শরীরে প্রবেশ করিলে গরু ক্ষিপ্ত হইয়া মারা যায়। অতএব আশু চিকিৎসা হওয়া দরকার।

চিকিৎসা

গরম জল /।০ এক পোয়া, ফিটকারী ২ তোলা এবং দ্রোণ ফুলের (দণ্ডকলসী ফুল গাছের) শিকড় চূর্ণ ৵১০ অর্দ্ধ ছটাক একত্র মিশাইয়া খাওয়াইলে দংশন জনিত বিষ নষ্ট হয়।

অগ্নিতে পোড়া ঘা আরোগ্যের উপায়

গরুর শরীরের কোন স্থান পুড়িয়া গেলে তৎক্ষণাৎ চুণের জল ও নারিকেল তৈল একত্র সমভাগে মিশাইয়া দগ্ধ স্থানে দিবে এবং ন্যাকড়া দ্বারা বাঁধিয়া রাখিবে। ঘা সম্পূর্ণ আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত প্রত্যহ ইহা দিতে হইবে।

জিহ্বার ঘা আরোগ্যের উপায়

গরুর জিহ্বায় ঘা হইলে স্থানে স্থানে কাঁটার তুল্য হয়, জিহ্বার নিম্নদেশে গর্ত্ত হয়।

চিকিৎসা

চিতল মাছের আঁইস-ভস্ম ক্ষতস্থানে লাগাইয়া মুখ বাঁধিয়া দিবে। ঘণ্টা দুই এরূপ অবস্থায় রাখিয়া বন্ধনটা খুলিয়া দিবে। এরূপ করিলে অল্প দিনের মধ্যে ঘা শুকাইয়া আরাম হইয়া যায়। বটগাছের ছাল ভস্ম করিয়া দিলেও বেশ ফল দর্শিবে।

ভস্ম করিবার নিয়ম

একটী মাটির হাঁড়ির মধ্যে চিতল মাছের আঁইসগুলি রাখিয়া হাঁড়ির মুখে একটি সরা চাপা দিয়া নীচে জ্বাল দিলেই পুড়িয়া ভস্ম হইবে। বটের ছালও ঐ ভাবে ভস্ম করিতে হয়। ছাল শুকাইয়া নিতে হয়।

আঘাত আরোগ্যের ঔষধ

গরুর শরীরে আঘাত লাগিলে সোহারা ও নিশাদল সমভাগে লইয়া জলের সহিত মিশাইয়া আঘাতপ্রাপ্ত অথবা মচ্‌কান স্থানে জলপটি দিলে অল্প সময়ের মধ্যে আরোগ্য হয়।

কাউর ঘা আরোগ্যের উপায়

এই কাউর ঘা গরুর স্কন্ধে হয়। যখন চুলকানি আরম্ভ হয় তখন গরু গাছে কাঁধ ঘসিয়া এই ঘা আরও বৃদ্ধি করে। কখন কখন কাকে ঠোকরাইয়াও ঘা বৃদ্ধি করে।

চিকিৎসা

১। ফিনাইল কিংবা কেরোসিন তৈল লাগাইলে গরুর কাউর ঘা অতি সত্বর আরোগ্য হয়।

২। মুদ্রাশঙ্খ আধ তোলা, মতিহার তামাক চূর্ণ ।/০ এক ছটাক, সরিষার তৈলের সহিত মিশাইয়া ৫।৭ দিন ঘায়ে মালিশ করিলে ভাল হয়।

৩। মতিহার তামাক জলে ভিজাইয়া জল ছাঁকিয়া সিদ্ধ করতঃ সরিষার তৈলের সহিত মিশাইয়া ঘায়ে দিলে বেশ ফল পাওয়া যায়।

বাঁটের ঘা আরোগ্যের উপায়

দুগ্ধবতী গাভীর বাঁট ফাটিয়া গিয়া ঘা হয়। তখন দোহন করা কঠিন হইয়া পড়ে।

চিকিৎসা

প্রত্যহ প্রাতে ও বৈকালে অল্প গরম জল দ্বারা বাঁট ধৌত করিয়া বাঁটে ৩।৪ তিন চারি দিন মাখন লাগাইয়া দিলে ভাল হয়। যদি বাঁট বেশী ফাটে এবং পূঁয বাহির হয় তবে নিমপাতা সিদ্ধ গরম জল দ্বারা ধৌত করিয়া ফিটকারী ৵০ দুই আনা ঘি ।/০ এক ছটাক, মোম ৴১০ অর্দ্ধ ছটাক, সফেদা /০ এক আনা একত্র করিয়া মিশাইয়া প্রতিদিন ৪।৫ বার বাঁটে লাগাইয়া দিলে বিশেষ উপকার হয়।

সর্প দংশন আরোগ্যের উপায়

লক্ষণ—গরুকে সাপে কামড়াইলে শরীরের লোম আলগা হয় এবং হাত দিলেই উঠিয়া যায়। অনেক সময় পায়ের শিরা ফুলিয়া উঠে ও শ্বাস প্রশ্বাস ঠাণ্ডা হয়।

চিকিৎসা

১। দ্রোণ ফুল গাছের (দণ্ডকলসী) পাতার রস প্রায় /॥০ আধ সের খাওয়াইয়া দিলে গরুর শরীরের বিষ নষ্ট হইয়া সত্বর আরোগ্য হয়। মানুষকেও সাপে কামড়াইলে এই ঔষধ

ব্যবহারে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। এই ঔষধ প্রথম সময় খাওয়াইলে কাজ ভাল করে।

২। আমড়ার ছাল ৪।৫ তোলা খাওয়ালেও বিষ নষ্ট হয়।

৩। কলমীশাকের একটি লতা গরুর মুখ হইতে লেজের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত মাপিয়া তাহা খাওয়াইলেও সর্প-বিষ সম্পূর্ণ রূপে নষ্ট হইয়া থাকে।

ক্রিমি রোগ আরোগ্যের উপায়

লক্ষণ—ক্রিমি হইলে গরুর পেট মোটা দেখায়, গায়ের লোমের গোড়া আলগা হইয়া যায়। গরু প্রায় কাশিতে থাকে। ক্ষুধা তৃষ্ণা খুব হয়, কিন্তু খাদ্যদ্রব্য রীতিমত হজম হয় না। গরু রোগা ও শীর্ণ দেখায়। থোঁপলার নীচে স্ফীত হইয়া উঠে। মাঝে মাঝে ভ্যাসকা ভ্যাসকা পাতলা বাহ্য হয়।

চিকিৎসা

১। কয়েকটি কাগজীলেবুর পাতা বাটিয়া একটি পাথর বাটিতে হুকার জলের সহিত গুলিয়া কিছু লবণ মিশাইবে। পরে উহা ছাঁকিয়া প্রত্যহ একবার করিয়া খাওয়াইলে এক সপ্তাহের মধ্যে ক্রিমি নষ্ট হইয়া যায়।

২। লবণ ১ তোলা, হিরাকসের গুড়া ৵০ আনা একত্র মিশ্রিত করিয়া কলাপাতার মধ্যে পুরিয়া খাওয়াইবে। ইহাতেও ক্রিমি নষ্ট হইয়া যায়।

পেট কামড়ানি আরোগ্যের উপায়

লক্ষণ—এই রোগে প্রায়ই লাদ (বাহ্যি) বন্ধ হয়। গরুগু কেবল চনায় (প্রস্রাব করে), পা ছড়াইয়া ছটফট করে এবং কখন কখন প্রস্রাবও বন্ধ হইয়া যায়।

চিকিৎসা

১। কদম পাতার রস /৴০ আধ পোয়া গুড় //০ এক ছটাক একত্র মিশাইয়া খাওয়াইলে পেট কামড়ানির উপশম হয়।

২। সোমরাজি ৩ তিন তোলা, ইন্দ্রযব ৩ তিন তোলা বৈঁচির শিকড়ের ছাল ৩ তিন তোলা একত্র করিয়া জল দিয়া বাটিয়া প্রতিদিন ৩ বার খাওয়াইলে বেশ উপকার হয়।

পেট ফাঁপা আরোগ্যের উপায়

১। গরুর পেটফাঁপিলে কদম পাতার রস /৴০ আধপোয়া পরিমাণ খাওয়াইয়া দিলে পেট ফাঁপা ভাল হয়। যাহাতে বাহ্যি ও প্রস্রাব হয় তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে।

২। গুড় /৴০ আধ পোয়া, কাঁচা হরিদ্রার গুড়া //০ এক ছটাক একত্র করিয়া খাওয়াইলে গরুর বাহ্যি ও প্রস্রাব হইয়া পেট ফাঁপা ভাল হয়।

শিং ভাঙ্গা আরোগ্যের উপায়

গরুর শিং ভাঙ্গিয়া গেলে ঘুটের ছাই গুঁড়া করিয়া লাগাইয়া দিলে ভাল হয়।

গাভী প্রসব করাইবার সহজ নিয়ম

১। যখন প্রসব-বেদনা উপস্থিত হয়, তখন গাভী ছটফট করিতে থাকে, একবার দাঁড়ায়, আবার শয়ন করে। সহজে প্রসব না হইলে ।৵০ আধ পোয়া পরিমাণ ঘোলের সহিত দেড় ছটাক ধুনা মিশাইয়া খাওয়াইলে অল্প সময়ের মধ্যেই প্রসব হইয়া যায়।

২। নাগদানার মূল ।৵০ দুই ছটাক ও চিতামূল ।/০ এক ছটাক, জলে মর্দন করিয়া সেবন করাইলেও অতি সত্বর প্রসব হইয়া থাকে।

ফুলপতন—প্রসবের পর গাভীর ফুল পড়িতে বিলম্ব হইলে কাঁজির জল ।৵০ আধ পোয়া, সাউল পানের শিকড় ।/০ এক ছটাক ও দেশী মদ ।৵০ আধ পোয়া একত্র করিয়া খাওয়াইলে অল্প সময়ের মধ্যে ফুল পড়ে।

২। কুকসিমার লতাপাতা পিসিয়া খাইলেও অচিরে ফুল পড়িয়া যায়।

প্রসবদ্বার ফাটা আরোগ্যের উপায়

গরুর প্রসব দ্বার ফাটিয়া গেলে ৪।৫ চারি পাঁচটী রসুন ।/• এক ছটাক নারিকেল তৈলের সহিত উত্তমরূপে জ্বাল দিয়া তিন বার করিয়া ঐ ফাটা জায়গায় ২।৩ দিন লাগাইয়া দিলেই সারিয়া যাইবে।

সূতিকা রোগ বা দুগ্ধ-জ্বর আরোগ্যের উপায়

গরুর ঐ রোগ হইলে কয়েক দিন অর্দ্ধ:পোয়া পরিমাণে দেশী মদ খাওয়াইয়া দিলেই আরোগ্য হয়, ইহা খুব ভাল ঔষধ।

বসন্ত

ইহা বড় ভয়ঙ্কর রোগ। কোন প্রকারে একটী গরুর বসন্ত হইলে ক্রমে পালের মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে। বিষ শরীরে প্রবেশ করিলে ৮।১০ দিনের ভিতরে প্রকাশ হইয়া পড়ে এবং রোগ দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। প্রকাশ হইবামাত্র আশু প্রতিকার করা উচিত।

লক্ষণ

প্রথম অবস্থা—কাণ ঝুলিয়া পড়ে, শরীর শিহরিয়া উঠে, দাঁত কড়মড় করে, ক্ষুধা হয় না, সময় সময় তৃষ্ণা হয়, আস্তে আস্তে জাবর কাটে, শরীরে বেদনা হয়, পেট খিচিয়া ধরে, মুখ গরম হয়, গরুর গোবর কফে মাখান থাকে ; এরূপ দেখা যায়, পিঠ কুঁজা হইয়া যায়, মেরুদণ্ডে হাত দিলে সহ্য করিতে পারে না।

মধ্যম অবস্থা—ঘন ঘন শ্বাস বহন করিতে থাকে, নড়াচড়া করিতে কষ্টবোধ হয়, পিঠে এবং শিরদাঁড়ায় বেদনা হয়, শরীর কোন সময় গরম, আবার কোন সময় ঠাণ্ডা হয়। ঢোক গিলিতে ও জাবর কাটিতে কষ্টবোধ হয়।

বাহ্যি করিতে কষ্ট হয়, চক্ষে ঝাপসা ঝাপসা দেখে, কিছুই খাইতে চায় না, জ্বর ও পিপাসা খুব বেশী হয়, মল এবং প্রস্রাবের দ্বার নোয়াইয়া পড়ে, জিহ্বা কাঁটা কাঁটা লাগে, পেটে চাপ ধরে, কিছু গিলিতে গেলে কষ্টবোধ হয়।

শেষ অবস্থা—নিশ্বাসে অতিশয় দুর্গন্ধ হয়, চক্ষু মুখ ও নাকের ছিদ্র দিয়া সর্ব্বদা আঠার মত কফ বাহির হয়। কখন কখন নাকের ছিদ্র চক্ষুর পাতা এবং জিহ্বার ভিতরের চাম উঠিয়া যায়। সম্মুখের দাঁত নড়ে, অনেক সময় চামের নীচে ফুলিয়া যায়। ঢোক গিলিতে বেশী কষ্ট হয় এবং গিলিবার সময় কাশে, সকল শরীর ঠাণ্ডা থাকে, রক্ত ও কফ মিশান বাহ্য হয়। শ্বাস ফেলিতে কষ্টবোধ হয় এবং গোঁ গোঁ শব্দ করে। পেট

ভাঙ্গিয়া পড়ে, অনেক সময় গরুর কুঁচকির, কাঁধের, পাঁজড়ার ও পালানের চামড়ায় ফুস্কুরি (গোটা) দেখা যায়। গরমের দিনে গরুর এই লক্ষণ ভাল, কিন্তু ফুস্কুরি (গোটা) না হইয়া রক্তামাশয়ের চিহ্ন থাকিলে লক্ষণ খারাপ হয়।

প্রধান লক্ষণ—মুখের মধ্যে, মাড়িতে এবং শরীরের অন্যান্য স্থানে গোটা হয়, রক্তামশায় মিশান বাহ্য হয়। চক্ষু, মুখ ও নাকের চাম উঠিয়া যাইয়া সেখান হইতে পূঁয পড়ে। শরীরে যত বেশী গোটা দেখা দিবে তত ভাল।

চিকিৎসা

বসন্ত পাকিবার পূর্ব্বে শিমুল তুলার বীচি বাটীয়া ইক্ষুগুড়ের সহিত মিশাইয়া কলাপাতার মধ্যে ভরিয়া গরুকে খাওয়াইবে। এইরূপ ৩ তিন দিন ৩ তিন বার করিয়া খাইতে দিবে।

পূর্ণ বয়স্ক গরুর পক্ষে প্রথম দিন প্রথম বার ২৫টি দ্বিতীয় বার ১৮টি, তৃতীয় বার ১০টী বীচি খাইতে দিবে। এইরূপ গরুর বয়স অনুসারে কম বেশী করিয়া এই বীচি ব্যবহার করিবে। প্রথম দিন প্রথম বার যে কয়টী বীচি লইবে ক্রমে প্রত্যেক বারে এবং প্রতি দিনে বীচির সংখ্যা কমাইতে হইবে।

রোগের প্রথম অবস্থায় যদি বাহ্য বন্ধ হইয়া যায় এবং পেট শক্ত থাকে, তবে দিনে ২।১ বার করিয়া কিছু লবণ অথবা লবণ বিশিষ্ট জিনিষ খাইতে দিবে। শক্ত জোলাপ দেওয়া নিষেধ, কারণ অতিরিক্ত দাস্ত হইলে গরু বেশী দুর্ব্বল হইয়া পড়ে।

প্রথম অবস্থায় কর্পূর ৮০ বার আনা, সোডা, চিরতা ঐ পরিমাণ, ধূতুরার বীচি সিকি কাঁচ্চা, দেশী মদ ।৵০ আধ পোয়া একত্র করিয়া যতক্ষণ পর্য্যন্ত তরল বাহ্য বন্ধ না হয়, ততক্ষণ ৩ ঘণ্টা পর পর এই ঔষধ ব্যবহার করিবে।

কফ, রক্ত ও রেচক ২৪ চব্বিশ ঘণ্টার অধিক কাল বাহির হইতে থাকিলে তাহা বন্ধ করিতে নিম্নলিখিত ঔষধও দেওয়া যাইতে পারে।

যথা—চক খড়ি চূর্ণ, আফিম, পলাশগঁদ (পলাশ ফুল গাছে এক রকম আঠা বাহির হয়) ও চিরতা চূর্ণ ভাল রকম গুড়া করিয়া ॥০ এক ছটাক দেশী মদের সহিত খাওয়াইয়া দিবে।

পথ্য

চাউল এবং কলাই ভালরূপে সিদ্ধ করিয়া তাহার মাড় দিবে। জল গরম করিয়া শীতল হইলে পান করিতে দিবে।

গরুর বসন্ত না হইবার উপায়

১। ধুতুরার ফুল গাছের মুল ।০ চারি আনা কি ।৶০ ছয় আনা গরুকে খাওয়াইলে গরুর বসন্ত রোগ হইবে না।

২। ওকরার ফুল কাল মুরগীর ডিম সহ বাটিয়া ঘাসের সহিত খাওয়াইলে গরুর বসন্ত রোগ হইবে না।

গরুর বসন্ত ভাল হইবার একটা ভাল ঔষধ

শ্বেত চামর ও শুকনা চর্ম্ম কিঞ্চিৎ কলার মধ্যে ভরিয়া খাওয়াইলে গরুর বসন্ত রোগ সত্বর ভাল হয়।

গরুর পাতলা বাহ্যি (ছেড়) হইলে আরোগ্যের উপায়

১। গরুর পাতলা বাহ্যি হইলে ২।১ দিন বাঁশপাতা খাওয়াইলে গরুর ছেড় (পাতলা বাহ্যি) ভাল হয়।

২। গরুর পাতলা বাহ্যি অগ্নিশ্বর গাছের পাতা খাওয়াইলেও ভাল হয়।

সুলক্ষণ ও কুলক্ষণ বিশিষ্ট গাভী

শুভ-লক্ষণ—যে গরুর জিহ্বা এবং তালু লাল বর্ণ, মাথা ছোট, কাণ ছোট অথচ উচুপনা, বুক প্রশস্ত, বাঁট চোকা ও লম্বা, চক্ষু লাল আভাযুক্ত, দাঁতের সংখ্যা ছয় অথবা নয়, শরীরের লোম দেখিতে সুন্দর এবং খুব তেলতেলে ও লালবর্ণ, পেট ঝোলা, সেই গাভী গৃহস্থের বাড়ী থাকিলে তাহার মঙ্গল হয়।

কুলক্ষণ—যে সকল গাভীর বর্ণ গাধার মত, শীরর বড় ও

কৃশ, দাঁতের সংখ্যা চার, সাত অথবা দশ, মুখ ও মাথা লম্বা, নাক চওড়া, শিং বড় ও চঞ্চল, সে সকল গাভী শুভকর নহে।

কোন্ গরুকে কিরূপ খাদ্য দিতে হয় ?

দুগ্ধবতী গাভীর খাদ্য—কলাই সিদ্ধ, সরিষার খৈল অথবা তিসির খৈল, চাউল এবং খেসারির ডাইল ও কাঁচা ঘাস।

ষাঁড়ের খাদ্য—খেসারির ডাইল এবং তাহার ভূষি, গমের ভূষি এবং সরিষা অথবা তিসির খৈল ও কাঁচা ঘাস।

হালি গরুর খাদ্য—খৈল, ভুষি, খড় ও ইহার সঙ্গে ঘাস দিবে।

গোয়াইল ঘর প্রস্তুত করিবার নিয়ম

উঁচু জায়গায় এবং যেখানে বেশ বাতাস ও রৌদ্র খেলে, সেখানে পূর্ব্ব অথবা উত্তরমুখ করিয়া গোয়াইল ঘর প্রস্তুত করিবে। বাসস্থানের নিকটই গরুর ঘর রাখিবে। ঘরে কোন প্রকার গর্ত্ত বা দুর্গন্ধ যেন না থাকে। ঘরের মেজে কিঞ্চিৎ ঢালু হওয়া দরকার, গোবর এবং চনা যাহাতে ঘর হইতে বাহিরে যাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিবে। প্রত্যহ ঘরে ধূপ ও দীপ দিবে। মশার উৎপাত দেখিলে সাজাল দিবে। এরূপ হইলে গরুর স্বাস্থ্য ভাল থাকিবে।

ইতি গো-চিকিৎসা বিধি।

পূর্ব্ব সূচনা

পুরাণ, তন্ত্র, জ্যোতিষ ও স্বর প্রভৃতি শাস্ত্রের মৃত্যুর পূর্ব্ব লক্ষণ গুলি বর্ণিত আছে। সেই মৃত্যু লক্ষণগুলি বুঝিয়া পরীক্ষা করা অনায়াসসাধ্য নহে। বিশেষতঃ অল্প শিক্ষিত ও সাধারণ লোকের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। এই কারণে যেগুলি সহজ এবং স্বরোদয় শাস্ত্রসম্মত এবং বহুবার পরীক্ষা দ্বারা প্রত্যহ ফল দেখিয়াছি, সেই সমস্ত লক্ষণগুলি শিক্ষিত, অশিক্ষিত সর্ব্ব-শ্রেণীর লোকের উপকারার্থ সহজ বোধগম্য ভাষায় লিখিয়া প্রকাশ করিলাম।

চক্ষু থাকিতে অন্ধ, সংসার-চক্রে ঘূর্ণ্যমান জনগনের জন্য অরিষ্ট লক্ষণ সকল বলিবার পূর্ব্বে কর্ম্মফল ও পরে অনুষ্ঠান তপস্যা সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে কিছু বলিয়াছি। ইহা পাঠ করিয়া যদি এক ব্যক্তিরও চক্ষু ফুটে, তাহা হইলে শ্রম সফল জ্ঞান করিব। এই বিষয়গুলি কোন মহাত্মার অনুগ্রহে প্রাপ্ত হইয়া নোট করিয়া রাখিয়াছিলাম তাহাই বর্ত্তমানে প্রকাশ করিলাম। সহৃদয় পাঠকগণ ভাষার দোষগুণ গ্রহণ না করিয়া পুস্তকের মুখ্যফল গ্রহণ করিলে সন্তুষ্ট হইব এবং আমার সানুনয় অনুরোধ যে, আমার ভ্রম-প্রমাদ, অজ্ঞানতা দেখিলে তাহা সংশোধন করিয়া দিবেন।

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।

মৃত্যু পরীক্ষা

—:•:—

অনবরত পরিবর্ত্তনশীল নশ্বর সংসারে সকলেই অনিশ্চিত, কেবল মৃত্যুই নিশ্চিত। ছায়া যেমন বস্তুর অনুগামী, মৃত্যুও তেমনি দেহীর সঙ্গী। গীতায় ভগবানের উক্তি—

"জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যু
ধ্রুব জং জন্ম মৃতস্য চ।"

জন্মগ্রহণ করিলে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। মৃত্যুর হাত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিবার উপায় নাই। মৃত্যু কাহাকেও উপেক্ষা করে না। অগণ্য গণ্য পরিবেষ্টিত লোকসংহারকারী বিবিধ অস্ত্র-সস্ত্র সমন্বিত সম্রাট হইতে বৃক্ষতলবাসী ছিন্নকন্থা-সম্বল ভিখারী পর্য্যন্ত সকলেই একদিন মৃত্যু মুখে নিপতিত হইতে হইবে।

কর্ম্মক্ষেত্রে সংসারের কোন কার্য্যের বা কোন বিষয়ের স্থিরতা ও নিশ্চয়তা নাই; কিন্তু মৃত্যু নিশ্চয় হইবে। মৃত্যুর মত অবশ্যম্ভাবী নিশ্চয়তা আর কিছুতেই নাই। প্রাতঃকালে সূর্য্যোদয় হইলে, সূর্য্যাস্ত যেমন অবশ্যম্ভাবী; দিবা অবসানে রাত্রি যেমন নিত্য সংঘটিত হইতেছে, তেমনি জন্মগ্রহণ করিলে মৃত্যু

হইবেই। শারীরিক বলবীর্য্য, ধন, জন, সম্পদ, মান, গৌরব প্রতাপ ও প্রভুত্ব প্রভৃতি সর্ব্ব গর্ব্ব মৃত্যুর নিকট খর্ব্ব হইবে। শাস্ত্রে পাওয়া যায় যে, সত্যযুগ হইতে কলিযুগ পর্য্যন্ত ৭ জন মৃত্যুকে উপেক্ষা করিয়া অমর হইয়াছেন যথা—

"অশ্বত্থমা বলিব্যাস হনুমানঞ্চ বিভীষণ
কৃপে পরশুরাম সপ্তেতে চিরজীবিনঃ ॥"

অর্থাৎ অশ্বত্থমা, পাতালবদ্ধ বলিরাজ ও ব্যাসদেব, হনুমান, বিভীষণ, কৃপচার্য্য, পরশুরাম এই সাতজন চিরজীবি বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত আছে।

জন্মতিথি পূজা করিবার সময় এই সাত নামের উল্লেখ হইয়া থাকে।

এই সাতজন ব্যতীত এই মর জগতে অমর কেহই নাই। অবশ্য যোগসাধন ও অন্যান্য ক্রিয়ানুষ্ঠান দ্বারা দীর্ঘ জীবন লাভ করা যায় সত্য ; কিন্তু জন্মগ্রহণ করিলে আর কিছু হউক, কিম্বা দশ বৎসর পরেই হউক, সকলেই সেই শমন-ভবনে যাইতে হইবে।

মৃত্যু অনিবার্য্য এবং সকলেই যেমন মৃত্যুর অধীন, তেমনি মৃত্যুর অবধারিত কাল নাই। মায়া মমতাহীন নির্দ্দয় মৃত্যুর সময় অসময় নাই, কালাকার বিচার নাই। মৃত্যু কাহার সুবিধা অসুবিধা দেখে না, কাহার উপরোধ অনুরোধ শুনে না, কাহার ভাল মন্দ চিন্তা করে না—কাহার দুঃখ কষ্ট বুঝে না,

মৃত্যু কাহার নিকট পূজা-অর্চ্চনা চাহে না,—কাহার তোষামোদে কি কোন প্রকার প্রলোভনে ভুলে না, কাহার রূপ গুণ, ধন মান গৌরবের প্রতি দৃক্‌পাত করে না।

মৃত্যু বয়সের অপেক্ষা করে না, সাংসারিক কার্য্য সম্পাদের অসম্পূর্ণতা ভাবে না, কখন কোন অজ্ঞাত প্রদেশ হইতে অলক্ষিতে আসিয়া আপন আয়ত্ত করিয়া লয়। ঐ দেখ বিধবা যুবতী ৪।৫টি শিশু লইয়া দুর্দ্দশায় দিশেহারা ও নিরাশা-নীরে নিমগ্ন এবং লণ্ডভণ্ড হইয়া চক্ষুর জলে বক্ষ ভাসাইতেছে, আর নিজের করে শিরে চপেটাঘাত করিয়া অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতেছে; কখনও বা বিধির বিধানের নিন্দা করিতেছে। আহা! উহাদের আসা ভরসার আকাঙ্খা যুবকের যৌবনান্ত না হইতে জীবনান্ত হইয়াছে। যে মৃত্যু শিশুদিগের মুখের দিকে না চাইয়া উহাদের অন্নদাতা জন্মদাতাকে গ্রহণ করিয়াছে, উপযুক্ত আহার অভাবে শিশুগণ শীঘ্র হয়তো সেই মৃত্যুর অধীন হইবে; এইরূপ প্রত্যহ দিনরাত কত কত মর্ম্মান্তিক ঘটনা দৃষ্টিপথে পতিত হইতেছে, কিন্তু নির্দ্দয় মৃত্যুর হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হয় না। মৃত্যু শোক তাপ, সময় অসময় কিছুই গ্রাহ্য করে না, কোন বাধা বিঘ্ন মানে না। কখন কোন ভাবে আসিয়া গ্রাস করিবে তাহার নিশ্চয়তা নাই; কিন্তু একদিন সকলকেই যে মৃত্যুর অধীন হইতে হইবে তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

প্রকৃত পক্ষে জগতে এমন কিছুই নাই ও মানুষ্যের এমন কোন সাধ্যই নাই, যদ্দারা ভীষণ বিভীষিকাময় মৃত্যুর গতিরোধ

করা যায়। অতএব যখন একদিন মরিতেই হইবে, তখন কতদিন পরে জীবনসঙ্গিনী সহধর্ম্মিণী ও প্রাণাধিক পুত্র কন্যা ছাড়িয়া ধনজনপূর্ণ সুখের সংসার ফেলিয়া শমন-ভবনে যাইতে হইবে, তাহা কাহার না জানিতে ইচ্ছা হয় ?

এক বৎসর কি ছয় মাস পরে মৃত্যু হইবে তাহা জানিতে পারিলে, সাংসারিক ও বৈষয়িক কার্য্যে বিশেষ সুবিধা হয় এবং নাবালক পুত্র কন্যাদের ভরণপোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের একটা সুবন্দোবস্ত করা যায়। আর কতদিন পরে সুখের সংসারের সমস্ত ছাড়িয়া যাইতে হইবে জানিতে পারিলে ঐহিক সকল কার্য্যের সুবিধা হউক না হউক, কিন্তু আর একটি কার্য্যের বিশেষ সুবিধা হয়, সেই কার্য্য এই—

পারলৌকিক।

নানাবিধ ভোগ-বিলাস বিজড়িত অনন্ত সুখদুঃখপূর্ণ সংসারে লোক সকল ইহলোকে কেহ আনন্দে ভাসিতেছে, কেহ দুঃখে ডুবিতেছে, কেহ নানা সুখভোগ করিতেছে, কেহ দুঃখ দুর্দ্দশায় কষ্ট পাইতেছে, কেহ হয় ত ধনীর গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া আজীবন আমোদ-প্রমোদে, সুখে-স্বচ্ছন্দে দিন কাটাইতেছে। কেহ হয় ত বৃক্ষতলবাসী হইয়া দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিয়া ভিক্ষা দ্বারা উদর পুরণ করিতেছে। কাহার হয় ত দুধে চিনি, আবার কাহার হয় ত শাকের উপর নুন মিলে না। এইরূপ নানা প্রকার বৈষম্য নিত্য চক্ষে প্রত্যক্ষ হইতেছে। এই বৈষম্যের কারণ কি ? সুখে সম্পদে, রোগে শোকে সকলেই

ভাগ্য বা অদৃষ্টের দোহাই দিতেছে। আবার কেহ বা পরম দয়াবান ভগবানের অবিচার বলিয়া সমস্ত দোষ ভগবানের স্কন্ধে চাপাইতেছে। কিন্তু বাস্তবিক কি ভগবানের দোষ? ভগবান কি কাহাকে সুখী, কাহাকে দুঃখী করিয়াছেন? কখনই নহে। অনন্ত করুণানিদান ন্যায়বান, পক্ষপাত-পরিশূন্য। তিনি রাজা, প্রজা, ধনী, গরীব, সুখী, পণ্ডিত, মূর্খ সকলেরই সমান চক্ষে দেখিয়া সমান স্নেহ বিতরণ করিয়া থাকেন। তাঁহার নিকট আত্মপর নাই। তাঁহার সৃষ্টিতে বৈষম্য নাই, পক্ষপাত নাই, তবে জগতে নিয়ম বৈষম্যের কারণ কি?—কারণ—মানুষ স্বীয় অদৃষ্ট অনুসারে সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। কিন্তু অদৃষ্ট ত দেখা যায় না, এই অদৃষ্টপূর্ণ অদৃষ্ট কি? অদৃষ্ট আর কিছুই নয়,—

নিজ নিজ কর্ম্মফল

মানুষের ভাল ও মন্দ যে কর্ম্ম, সেই কর্ম্মানুরূপ শুভাদৃষ্ট বা দুরদৃষ্টরূপে ভালমন্দ ফল প্রদান করিয়া থাকে। কর্ম্ম দ্বিবিধ—পাপ ও পুণ্য। এই কর্ম্মক্ষেত্রে সংসারের মানুষ সম্পূর্ণরূপে কর্ম্মের অধীন। গত জন্মে মানুষ যেমন কর্ম্ম করিয়াছে, বর্ত্তমান জন্মে সেই কর্ম্মই অদৃষ্টরূপে ফল প্রদান করিতেছে। আবার বর্ত্তমান দেহে যেরূপ কর্ম্ম করিবে, পরজন্মে তদনুরূপ ফল ভোগ করিবে। অবশ্য যাহারা হিন্দু-ধর্ম্ম ও শাস্ত্রে অবিশ্বাসী এবং পরকাল পুনর্জন্ম স্বীকার করে না, তাহাদের ইহা ভাল লাগিবে না, তাঁহারা এই অংশ বাদ দিয়া শেষাংশ মৃত্যু-পরীক্ষা

পাঠ করিবেন ও পরীক্ষায় বুঝিবেন। যাহারা হিন্দু এবং হিন্দু-ধর্ম্ম ও প্রাচীন মুনি ঋষিগণের লিখিত শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের জন্য বলিতেছি যে মানবের কর্ম্মই অদৃষ্টরূপে প্রতিভাত হইয়া ফল প্রদান করিয়া থাকে। শুভ কর্ম্ম করিলে শুভাদৃষ্ট হয় অর্থাৎ শুভ ফল প্রদান করে, আর মন্দ কর্ম্ম ও অধর্ম্ম করিলে দুরাদৃষ্টরূপে দুঃখদুর্দ্দশা ভোগ করিতে হয়। পূর্ব্বে বলিয়াছি মৃত্যু যেমন অবশ্যম্ভাবী তেমনি কর্ম্ম-ফল ভোগও অবশ্যম্ভাবী। অনন্ত জ্ঞানাভার মহামতি ভীষ্ম বলিয়াছেন,—

"মাভুক্তং ক্ষিয়তে কর্ম্ম কল্পকোটি শতৈরপি
অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতকর্ম্ম শুভাশুভং।"

(মহাভারত)

ভাল ও মন্দ যে কর্ম্ম করিবে, তাহার ফলভোগ অবশ্য করিতে হইবে।

অবশ্য মন্দফল ভোগ করিতে কেহ চায় না, কিন্তু কর্ম্ম তোমার, কর্ম্ম তো তোমাকে ছাড়িবে না। তুমি স্বর্গেই থাক আর মর্ত্ত্যেই থাক যেখানে যাইবে, তোমার কৃতকর্ম্ম, তোমার নিকট যাইয়া ফলভোগ করাইবে। তুমি যদি ভাল কর্ম্ম করিয়া থাক তবে অবশ্যই ভাল ফল ভোগ করিবে; আর মন্দ কর্ম্ম, পাপ ও অধর্ম্মজনক কার্য্য করিয়া থাক, তদনুরূপ মন্দফল অবশ্যই ভোগ করিবে সন্দেহ নাই।

পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্রে কর্ম্মফল ভোগের কথা আছে। যাহারা শিকার দোষে, সংসর্গের গুণে, বয়সের চাপল্যে পরকাল ও কর্ম্মগুণে জন্ম, কর্ম্ম, অদৃষ্ট স্বীকার করে না, তাহাদেরও পরিণামে একদিন নিশ্চয় স্বীকার করিতে হইবে। ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণও অনেক দেখিয়াছি। শাস্ত্রে ব্যক্ত আছে যে,—"কর্ম্মের দরুণই জীবের জন্ম হয়, কর্ম্মের দরুণই জীব মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়।" জলৌকার ন্যায় জীব উত্তর দেহকে অবলম্বন করিয়া পূর্ব্ব দেহ পরিত্যাগ করিয়া থাকে। কিন্তু এই উত্তর দেহ পাইবার কারণও জীবের কর্ম্ম। পূর্ব্বজন্মে যেরূপ কর্ম্ম করিয়াছে, মৃত্যুর পর তদনুরূপ দেহ রূপ ও গুণ ধন মান, বিদ্যা বুদ্ধি ও অদৃষ্ট পাইয়া সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। ইহাই বিধির বিধি, ইহাই শাস্ত্রে লিখিত নিশ্চিত সত্য। শাস্ত্রে কথিত আছে যে, "মানুষ কর্ম্ম দ্বারা সুখভোগ করে, কর্ম্মের দ্বারাই দুঃখ ভোগ করে। কর্ম্মবশেই তাহারা জন্মগ্রহণ করে, কর্ম্ম দ্বারা শরীর ধারণ করিয়া থাকে এবং কর্ম্মবশেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়।"

"কর্ম্মণা সুখ মশ্নন্তি দুঃখমশ্নুতি কর্ম্মণা।
জায়ন্তে চ প্রলীয়ন্তে বর্ত্তন্তে কর্ম্মণো বশাৎয়।"

এক ব্যক্তি রোগে, শোকে, দুঃখ ও দারিদ্র্যে কষ্টভোগ করিতেছে। সে ব্যক্তি এ জীবনে কোন পাপ কার্য্য করে নাই। পর-দোষ দর্শনে আমারা খুব পটু; সুতরাং অনেকেই বলিবে "ঐ লোকটা অনেক পাপ করিয়াছে, এখন কুকর্ম্মের ফলভোগ করিতেছে," ইহাই না হয় স্বীকার করিলাম। কিন্তু পঞ্চম বর্ষীয়

বালকবালিকা কঠিন রোগে দীর্ঘকাল কষ্ট পাইতেছে। কেহ বা বিকলাঙ্গ হইয়া অকর্ম্মণ্য শরীর বহন করিতেছে। উহারা তো এ জন্মে কোন পাপ কর্ম্ম করে নাই। উহাদের ভাল মন্দ কোন জ্ঞান হয় নাই, পাপ পুণ্য বুঝে নাই, সুতরাং এ জন্মে পাপ পুণ্য কিছুই নাই, তবে কেন উহারা বিষম দুঃখ কষ্ট ভোগ করিতেছে। এই সব দেখিয়া কোন্ নির্ব্বোধ বলিবে যে, ভগবান উহাকে কষ্ট দিতেছেন। কিন্তু ধার্ম্মিক ও জ্ঞানবান ব্যক্তির একথা কর্ণগোচর হইলে, তিনি বলিবেন যে,—"ভগবানের কোন দোষ নাই" উহার জন্মান্তরীণ কর্ম্মফলে ও জন্মে দুর্দ্দশা ভোগ করিতেছে। বাস্তবিক এ কথা সত্য। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ভগবান সর্ব্বজীবে সমান দয়া করেন এবং সমদৃষ্টিতে সকলকে দেখিয়া থাকেন। সুতরাং উহারা যে পূর্ব্ব জন্মের নিজকৃত কর্ম্মফল ভোগ করিতেছে, এ জন্মের দুঃখ দুর্দ্দশা তাহার সত্যতা প্রতিপন্ন করিতেছে। অতএব কর্ম্মানুযায়ী ফলভোগ অবশ্যই করিতে হইবে।

যাহারা মনুষ্যকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া ধনোপার্জ্জন, পরিবার পোষণ ও ভোগ-বিলাসে দিন যাপন করাই মানব জীবনের চরমোন্নতি এবং একমাত্র কর্ত্তব্য স্থির করিয়া নিশ্চিত; যাহারা ধনসংগ্রহ, যশ, মান প্রভৃতির আশায় সর্ব্বদা ব্যতিব্যস্ত; যাহারা ধর্ম্মের ধার ধারে না, ভ্রমেও ভগবানের নাম স্মরণ করে না। ইহাদের সকলেরই পরজন্মের সুখের পথ কণ্টকাকীর্ণ। পূর্ব্ব জন্মের সৎকর্ম্মের ফলে এই জন্মে ধনী হইয়াছে। কিন্তু এই

জন্মে ধর্ম্মে কর্ম্মে রত থাকিয়া অর্থের সদ্ব্যবহার ও সাধন ভজনাদি না করিলে পরজন্মে দুঃখ দরিদ্রতা অবশ্যই হইবে। অসীম ধীশক্তিশালী তীক্ষ্ণ বুদ্ধি পণ্ডিত চাণক্য বলিয়াছেন—

"কর্ম্ম দোষেণ দরিদ্রতা।"

কথা সত্য। যাহারা পূর্ব্ব জন্মে ধর্ম্মার্থে পুণ্যার্থে অর্থের সদ্ব্যবহার করে নাই, তাহারাই বর্ত্তমান জন্মে দরিদ্রতার ভীষণ আবর্ত্তে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছে। যাহারা বর্ত্তমান জন্মে আয় ও অবস্থানুরূপ অর্থের সদ্ব্যবহার এবং সাধন ভজন করিতেছে না, তাহারা আগত জন্মে দরিদ্ররূপে নানা দুঃখ দুর্দ্দশা ভোগ অথবা পশ্বাদি যোনিতে জন্ম প্রাপ্ত হই বে।

"অর্থ কপূয় চরণাঃ অভ্যাসেহ কপূয়াং যোনিমাপদ্যেরণন্ন শ্বযোনি বা শূকর যোনিং বা চণ্ডাল যোনিং বেত্তি।"

অর্থাৎ বিধিনিষিদ্ধ শাস্ত্রবিরুদ্ধ পাপ কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা শীঘ্র নীচ যোনি কিংবা শূকর, কুকুর, প্রভৃতি পশু যোনি অথবা গীতায় ভগবান বলিয়াছেন—

"তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরাণ সংসারেষু নরাধম
ক্ষিপাস্যজস্র মাস্নভানা স্নরীস্বেব যোনিষু।"

নিত্য অশুভ কর্ম্মানুষ্ঠান রত ও দ্বেষী, ক্রূর, নরাধম প্রভৃতি অসুর প্রকৃতি মানবগণকে আমি জন্ম মৃত্যু-মার্গে নিপতিত করিয়া অতি ক্রূর ব্যাঘ্র সর্পাদি যোনিতে ভ্রমণ করাই।

অতএব যাহারা ধনোপার্জ্জন ও বিলাসে জীবন যাপন

করিতেছেন, ধর্ম্মকর্ম্ম সাধন এবং ভজন করিবার অবসর পান নাই, তাঁহারা যদি জানিতে পারেন যে আর এক বৎসর কি ছয় মাস পরে স্ত্রী-পুত্রাদি ও সাধের ধন ও বিষয় আশয় ভবসংসারের সব ছাড়িয়া শূন্য হস্তে নিঃসম্বল অবস্থায় অসহায় একা চলিয়া যাইতে হইবে, তাহা হইলে বিষয়-বিভবাদির জন্য সুবন্দোবস্ত এবং পুণ্যাদি কর্ম্মের দ্বারা পরলোকেরও ইষ্ট সাধন করিতে পারিবেন।

সকল শ্রেণীর লোক যেমন ইহজীবনের সাংসারিক স্বার্থ লইয়া তৎপর, তেমনি ইহ-পরলোকের মঙ্গল ও সুখের জন্য সকলেরই স্ব স্ব জাতীয় ধর্ম্মানুষ্ঠান ও সাধন ভজন করা কর্ত্তব্য।

সকল প্রাণী অপেক্ষা মনুষ্য শ্রেষ্ঠ। এই বিশ্ব সংসারে জলে স্থলে আশি লক্ষ যোনিতে ভ্রমণ করিয়া পরে মনুষ্য-জন্ম লাভ হয়। পশু পক্ষী আদি হইয়া কত জন্ম কোথায় থাকিতে হয়, তাহা শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে।

"স্থাবরং বিংশলক্ষন্তু জলজা নব লক্ষকাঃ।
কৃমিজা রুদ্রলক্ষাস্তু পাশবো দশ লক্ষকাঃ।
অণ্ডজা ত্রিংশলক্ষাস্তু চতুর্লক্ষাস্তু মানবাঃ।"

জলে ও স্থলে, পশু, পক্ষী, কীট পতঙ্গাদি, নানারূপ আশি-লক্ষবার জন্মগ্রহণ করিয়া শেষে মানব দেহে চারি লক্ষবার জন্মগ্রহণ করিতে হয়। মানবদেহ ধারণ করিয়া পুণ্যপ্রভাবে ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। কারণ ভারতবর্ষের ন্যায় পুণ্যপ্রদ স্থান পৃথিবীর আর কোথাও নাই। প্রাণীগণ বহু জন্মের

পর কদাচিৎ পুণ্যভূমি ভারতে মানব-জন্ম লাভ করিয়া থাকে। শাস্ত্রে উক্ত আছে যে, ভারতবাসীরা দেবগণ হইতেও শ্রেষ্ঠ এবং ধন্য, কারণ তাহাদের জন্মভূমি স্বর্গ ও মোক্ষ উভয় লাভের হেতু। স্বর্গপ্রদ পুণ্যকর্ম্ম ক্ষয় হইলে আবার কি প্রকারে সমুদয় ইন্দ্রিয়-যুক্ত হইয়া ভারতে জন্মগ্রহণ করিব দেবতারাও এই কামনা করেন। প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষ পারলৌকিক কার্য্যানুষ্ঠানে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। মর্ত্তলোকের মধ্যে এই ভারতবর্ষে বসিয়াই মুনি ঋষিরা তপস্যা করিয়া থাকেন। পরলোকের আদর ও উপকারার্থ যে কিছু দান কার্য্য তাহাও এই স্থানে সম্পাদিত হইয়া থাকে। ভারতবাসীরা পৃথিবীর মধ্যে ভারতভূমিকে কর্ম্মভূমি বলিয়া ইহ-পারলৌকিক মঙ্গল উদ্দেশ্যে ধর্ম্ম কার্য্যানুষ্ঠান করিয়া থাকে।

এ হেন দেব-প্রার্থিত ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়া যাহারা ধর্ম্মচিন্তা ও পারলৌকিক মঙ্গলোদ্দেশ্যে কার্য্যানুষ্ঠান না করে, তাহারা অতি মন্দভাগ্য এবং পাপের জীবন্ত মূর্ত্তি।

সাংসারিক ও বৈষয়িক কার্য্যে নিয়ত ব্যাপৃত থাকিয়াও সকলেরই ধর্ম্মানুষ্ঠান ও উপাসনা করা কর্ত্তব্য।

যাহারা ধন উপার্জ্জন, ধনসংরক্ষণ ও ধনের পরিমাণ বৃদ্ধি করণ চিন্তায় সতত নিযুক্ত এবং যাহারা চব্বিশ ঘণ্টাকাল সংসার নিয়া ব্যাপৃত ;—যাহারা এই মর-জগতে অমর ভাবিয়া চিরকালের জন্য কায়েমী পাট্টা লইয়া আসিয়াছেন মনে করিয়া

সতত স্বার্থ সাধনে রত থাকিয়া ধর্ম্ম কর্ম্ম করিতে ও ভগবানের আরাধনা করিতে সময় পান নাই, অথবা তৎ প্রবৃত্তি যাহাদের মনের মধ্যে স্থান পান নাই, তাহারা যদি জানিতে পারেন যে, মৃত্যু ভীষণ বদন ব্যাদান করিয়া সম্মুখে তাণ্ডব নৃত্য করিতেছে ; আর ছয় মাস কি এক বৎসরান্তে ইহ সংসারের ধন সম্পদ প্রিয় পরিজনাদি ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে, তাহা হইলে আর কিছু হউক না হউক, ঐ অল্প সময়ের মধ্যেও পরকালের মঙ্গল-জনক অনেক কার্য্য করিতে পারেন।

সংসারের চক্রে ঘূর্ণ্যমাণ ও মায়ামরিচিকায় মোহিত সাংসারিক লোকের সদগতি কি প্রকারে হইবে, মরণের লক্ষণ-গুলি জানিয়া অল্প সময়ের মধ্যে কিরূপে পরজন্মের সুখের পথ সুপ্রশস্ত ও পারলৌকিক দুঃখদুর্গতি দূর করিয়া সুখ-সৌভাগ্য লাভ করা যায়, তাহা জানিতে কাহার না ইচ্ছা হয় ? অগ্রে মৃত্যুলক্ষণগুলি বলিয়া পরে তদ্বিষয়ের সদুপায় ও কর্ত্তব্য বর্ণন করিব।

মরণের পূর্ব্বে মনুষ্যের শরীরে নানাবিধ বিকার উদ্ভব হইতে থাকে। সে সকল বিকার ও সেই সকল মরণ-লক্ষ যোগীরা উত্তমরূপে বুঝিতে পারেন। আমরা তাহা কিছু মাত্র বুঝিতে পারি না। তন্ত্র, পুরাণ, জ্যোতিষ ও স্বরোদয় শাস্ত্রে অনেক রকমের মৃত্যু-চিহ্ন বা মৃত্যু-লক্ষণ বর্ণিত আছে। সেই সমস্ত একত্রে সংগৃহীত করিলে বৃহদাকার পুস্তক হইয়া পড়ে।

তাহা পাঠ করিয়া মৃত্যু-লক্ষণ নির্ণয় করা সাধারণের পক্ষে একেবারেই দুঃসাধ্য। এজন্য সাধু মহাত্মাদের নিকট যে সকল সহজ মৃত্যু-লক্ষণ জানিয়াছি এবং বহুবার পরীক্ষা দ্বারা প্রত্যক্ষ সত্য ফল দেখিয়াছি, সে সমস্ত সংক্ষেপে ব্যক্ত করিতেছি।

দাতব্যং গুরুভক্তায় ন দদ্যাদুষ্টমানসে।
যস্মৈ কস্মৈ ন দাতব্যং নান্যথা শঙ্করোদিতং ॥

অর্থাৎ এই বিষয় গুরুভক্তিচিত্ত ব্যক্তিকেই প্রদান করিবে। দুষ্টমতি এবং যাহাকে তাহাকে দিবে না। ইহাই শিববাক্য।

মৃত্যু লক্ষণ

(১)

নিজস্য প্রতিবিম্বস্য নিশ্চলেষুদকাদিষু।
উত্তমার্ধং ন পশ্যেদ্ যঃ ষণ্মাসেন বিনশ্যতি ॥

স্থির জলের উপর যে ব্যক্তি নিজের ছায়া মস্তকহীন অবলোকন করে, ছয় মাসের মধ্য তাহার মৃত্যু হয়।

(২)

করাবরুদ্ধশ্রবণঃ নংস্বণোতি ন চ ধ্বনিং।
স্থূলঃ কৃশঃ কৃশঃ স্থূলস্তদা মাসান্নবর্ত্ততে ॥

হস্ত দ্বারা দুই কর্ণ অবরুদ্ধ করিলে বাহিরের কোন শব্দ শুনা যায় না, কিন্তু কর্ণকুহরে বায়ুর এক প্রকার অস্পষ্ট অব্যক্ত শব্দ শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে। ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম। যে ব্যক্তি কর্ণদ্বয় হস্তদ্বারা অবরুদ্ধ করিয়া কর্ণকুহরান্তর্গত ঐ প্রকার শব্দ শুনিতে না পায় এবং কোন কারণ নাই, হঠাৎ স্থুল শরীরবিশিষ্ট ব্যক্তি যদি অকস্মাৎ কৃশ হয় ও কৃশ ব্যক্তি অকস্মাৎ (বিনা কারণে) স্থুল হয়, তাহা হইলে একমাস মধ্যে মৃত্যু নিশ্চিত।

(৩)

ত্রিধায় কর্ণনির্ঘোষং ন স্বণোত্যাত্ম সম্ভবম্।
নশ্যতে চক্ষুষো জ্যোতির্যস্য সোহপি ন জীবতি ॥

দুই কর্ণ আচ্ছাদন করিলে বাহিরের কোন শব্দ শুনা যায় না; কিন্তু নিজের উচ্চারিত শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। যে ব্যক্তি কর্ণ আচ্ছাদন করিয়া আপনার উচ্চারিত শব্দ শুনিতে না পায় এবং যাহার চক্ষুর জ্যোতি নষ্ট হইয়া যায়, সে ব্যক্তি অধিক দিন বাঁচে না।

(৪)

নাসিকা বক্রতামেতি করয়োর্ণমন্নেতি।
নেত্রে বাষ্পংক্ষেরেদ যস্য স গচ্ছেদ যমমন্দিরং ॥

নাসিকা বাঁকিয়া গিয়াছে, কর্ণদ্বয় নিম্নদিকে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে এবং চক্ষে জল বাহির হইতেছে এরূপ দেখিলে মরণ নিকট হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

এরূপ লক্ষণের পূর্ব্বে কখন কাহার কাহার দুই চক্ষে জল বাহির না হইয়া কেবল বামচক্ষে নিঃসাড়ে জল বাহির হইয়া থাকে। ইহা প্রত্যক্ষ দেখা গিয়াছে।

(৫)

সুস্নাতস্যাপি যস্যাশু হৃদয়ং পরিশুষ্যতি।
চরণৌচ কারৌ চাপি ত্রিমাসং তস্য জীবিতং ॥

স্নান করিবামাত্র যাহার বুকের জল হস্তপদ অবিলম্বে শুকাইয়া যায়, তাহার আয়ু তিন মাসে শেষ হয়।

কাহার কাহার হাত ও পায়ের জল না শুকাইয়া, কেবল বুকের জল শুকাইয়া যায়। এরূপ হইলে বুঝিতে হইবে অর্থাৎ যে দিন স্নান করিবামাত্র বুকের জল শুকাইয়া যায় সেইদিন হইতে ছয় মাস জীবিত থাকিবে। পরীক্ষিত।

(৬)

ভদ্রেহ্ হ্নিবারে স্থূর্য্যাস্য পুষ্টিকৃত্যা দিবাকরং।
প্রকৃত্যাপ্সু স্থন পশ্যেৎ ষণ্মাসেন মৃত্যুভাক্॥

ভাদ্রমাসের রবিবারে দিবাভাগে যে ব্যক্তি জল মধ্যে সূর্য্যের ছায়া দেখিতে পায় না ছয় মাস পরে তাহার মৃত্যু হয়।

(৭)

ঘৃতে তৈলে তথাদর্শে তোয়ে চ তনুমাত্মনঃ।
যশ্চ পশ্যেদ শিরস্কাং মাসাদূর্দ্ধং ন জীবিত॥

যে ব্যক্তি ঘৃতে, তৈলে আদর্শে অথবা জলে আপনার দেহ মস্তকহীন দৃষ্টি করে, সে ব্যক্তি একমাসের অতিরিক্ত বাঁচে না।

প্রত্যহ প্রাতে ঘৃতে নিজ প্রতিবিম্ব দর্শন করিলে পরমায়ু বৃদ্ধি হয়। প্রাতে শৌচ-ক্রিয়ান্তে মুখ হাত ধুইয়া বস্ত্র ত্যাগ করিয়া ঘৃতে মুখ দেখিলে আয়ু বৃদ্ধি হয়, শরীর সুস্থ থাকে। যোগীরা বলেন ইহা পরীক্ষিত সত্য। চেতনা (চ্যাটালো) পাথরের

বাটীতে তরল ঘৃত লইলে বেশ মুখ দেখা যায়। কিন্তু গব্য ঘৃত হওয়া আবশ্যক। আর মুখের এরূপ নিকটে ঘৃতপাত্র রাখিতে হয় যে, মুখ দেখিবার সময় ঘৃতের ঘ্রাণ যেন নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করে। নিত্য এরূপ করিলে মন প্রফুল্ল ও শরীর সুস্থ থাকে ইহা বিশেষ পরীক্ষিত।

(৮)

যস্য বীর্য্যং মলং মূত্রং ক্ষুতং সুনমদন্তরং।
ইহৈকদা ভবেত্তাপি অব্দং তস্যায়ুরুচ্যতে॥

যাহার বীর্য্য, মল, মূত্র, হাচি এক সময়ে নির্গত হয়, সে ব্যক্তি সেই দিন হইতে এক বৎসর জীবিত থাকিবে।

(৯)

মূত্রং পুরীষং বায়ুশ্চ সমকালং প্রজায়তে।
তদাসৌ চলিতো জ্ঞেয়া দশাহে ম্রিয়তে ধ্রুবম্॥

যাহার মল, মূত্র, অধোবায়ু এক সময়ে একত্র বহির্গত হয় দশ দিন পরে সেই ব্যক্তির মৃত্যু হইবে।

(১০)

সংপ্রবর্ত্তে নিধুবনে মধ্যান্তে ক্ষৌতি যো নরঃ।
নিশ্চিতং পঞ্চমে মাসি ধর্ম্মরাজাতিথির্ভবেৎ॥

যে ব্যক্তি স্ত্রীসংসর্গে প্রবৃত্ত হইয়া মধ্যে ও অন্তে হাঁচে, সে ব্যক্তি পাঁচ মাস পরে যমরাজার বাড়ীতে অতিথি হইবে।

(১১)

যস্য বৈস্নাত গাত্রস্য কপোলমাস্ত শুষ্যতি।
পীতঞ্চাপি জলং ভবেৎ দশাহং তস্য জীবনম্॥

যাহার স্নান করিবামাত্র গণ্ডস্থল শুষ্ক হয় এবং যে ব্যক্তি নদী পুষ্করিণী প্রভৃতির জল পীতবর্ণ দর্শন করে, সে ব্যক্তি দশ দিনের অধিক কিছুতেই বাঁচিবে না।

(১২)

যস্য বক্ত্রে শবগন্ধো গাত্রে বসনয়োরপি।
তস্যায়ুর্মাসৈকংজ্ঞেয়ং যোগিনামপি জীবনম॥

যে ব্যক্তির মুখে, গাত্রে, বস্ত্রে শবগন্ধ নির্গত হয়, সে যদি পরম যোগী হয়, তথাপি একমাস পরে মৃতুমুখে নিপতিত হইবে।

কখন কখন কাহার শরীরে শবগন্ধ প্রকাশ না হইয়া শরীর হইতে অগ্নিগন্ধ নির্গত হইতে থাকে, এরূপ হইলে সে ব্যক্তির আয়ু এক মাসের কিছু অধিক আছে, ইহা অনুমান করিবে।

(১৩)

যে ব্যক্তি প্রদীপ নির্ব্বাচনের গন্ধ পায় না এবং রাত্রিকালে অগ্নি দেখিয়া "ভয় পায়" এরূপ ব্যক্তি ছয় মাসের অধিক কোন মতেই জীবিত থাকে না।

প্রদীপ অর্থে এখনকার প্রচলিত কেরোসিন তৈলের ল্যাম্পাদি নহে। বাঙ্গালীর চির-প্রচলিত মাটির প্রদীপ সর্ষপ বা রেড়ীর তৈলে পলিতা দিয়া যাহা জ্বলিয়া থাকে।

(১৪)

যস্য বৈ ভুক্তমাত্রস্য হৃদয়ং বাধ্যতে ক্ষুধা।
জায়ন্তে দন্তহর্ষাশ্চ স গতায়ুঃ ন সংশয়ঃ॥

যাহার আকণ্ঠপূর্ণ আহার করিবামাত্র অনতিবিলম্বে পুনরায় ক্ষুধার উদ্রেক হয় এবং দন্তহর্ষ উপস্থিত হয়, তাহার মৃত্যু অতি নিকটে বুঝিতে হইবে।

(১৫)

অহোরাত্রং যদেকত্র বহতে যস্য মারুতঃ।
তদা তস্য ভবেদায়ুঃ সংপূর্ণ বৎসরত্রয়ঃ॥

দিবারাত্রি যাহার উভয় নাসিকায় এক সঙ্গে শ্বাসবায়ু প্রবাহিত হয় সে ব্যক্তি সেই দিন হইতে তিন বৎসর পরে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইবে।

যাহারা জানেন দুই নাসিকায় সমান ভাবে শ্বাস প্রবাহিত হইয়া থাকে তাহা ভ্রম। নিশ্বাসের স্বাভাবিক নিয়ম এই যে এক নাসিকায় এক ঘণ্টা পর্য্যন্ত শ্বাস প্রবাহিত হইয়া আবার অপর নাসিকায় এক ঘণ্টা কাল শ্বাস প্রবাহিত হয় এইরূপ ভাবে দিবারাত্র একবার বাম নাসিকায় এক ঘণ্টা ও একবার

দক্ষিণ নাসিকায় এক ঘণ্টা পর্য্যায়ক্রমে শ্বাস প্রবাহিত হইয়া থাকে। ইহার বিস্তারিত বিবরণ মৎপ্রণীত গুরুবাক "দ্বিতীয় ভাগে" বর্ণিত আছে।

(১৬)

অহোরাত্রং দ্বয়ং যস্য পিঙ্গলায়াং সদাগতিঃ।
তস্য বর্ষদ্বয়ং জ্ঞেয়ং জীবিতং তত্ত্বাদিভিঃ॥

যে ব্যক্তির উপর্য্যুপরি দুইদিন দক্ষিণ নাসিকায় নিয়ত শ্বাস প্রবাহিত হয়, সেই ব্যক্তি দুই বৎসরের অধিকাল জীবিত থাকে না।

(১৭)

ত্রিরাত্রং বহতে যস্য বায়ুরেক পুটে স্থিতঃ।
সংবৎসরং যাবদায়ুঃস্যাৎ বদন্তি মনীষিণঃ॥

যদি ক্রমাগত তিন দিন এক নাসিকায় অনবরত শ্বাস প্রবাহিত হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, সেই দিন হইতে আর এক বৎসর পরমায়ু আছে।

(১৮)

একাদি ষোড়শাহানি যদি ভানুর্নিরন্তরম্।
বহেদ যস্যচ বৈ মৃত্যুঃ শেষাহেন চ মাসিকৈ॥

যদি একাধিক্রমে ষোল দিন দক্ষিণ নাসিকায় নিয়ত শ্বাস প্রবাহিত হয়, তাহা হইলে প্রথম দিন হইতে ত্রিশ দিনের দিন মৃত্যু হইবে।

(১৯)

সম্পূর্ণং বহতে সূর্য্যশ্চন্দ্রমা নৈব দৃশ্যতে।
পক্ষেণ জায়তে মৃত্যুকাল জ্ঞানেন ভাষিতম ॥

বৎসর বা মাসের প্রথম দিন কিম্বা শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষের কোন প্রতিপদের দিন দক্ষিণ নাসিকায় নিয়ত যদি শ্বাস প্রবাহিত হয় এবং সেদিন একেবারেই বাম নাসিকায় শ্বাস বহন না হয়, তাহা হইলে পনর দিন মধ্যে মৃত্যু হইবে।

(২০)

সম্পূর্ণং বহতে চন্দ্রঃ সূর্য্যো নৈবচ দৃশ্যতে।
মাসেন দৃশ্যতে মৃত্যুকাল জ্ঞানেন ভাষিতম ॥

বৎসর বা মাসের প্রথম দিন অথবা কোন পক্ষের প্রতিপদে বাম নাসিকায় নিয়ত যদি শ্বাস বহন হয়, তাহা হইলে একমাস মধ্যে মৃত্যু হইবে।

প্রাতঃকালে সূর্য্যোদয়ের সময় হইতে এক ঘণ্টা বাম নাসিকায়, পরে দক্ষিণ নাসিকায় একঘণ্টা নিশ্বাস বহন হইয়া থাকে। এইরূপ দিবা রাত্রি মধ্যে বারো বার বাম নাসিকায় বারো বার দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাস বহন হইয়া থাকে, ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম। ঐরূপ নিয়মে নিশ্বাস বহন না হইয়া যদি একদিন নিয়তই বাম নাসিকায় কিম্বা দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাস বহন হইয়া থাকে, তাহার মৃত্যুর পূর্ব্ব লক্ষণ বুঝিতে হইবে।

(২১)

রাত্রৌ চন্দ্রো দিবা সূর্য্যো বহেদ যস্য নিরন্তরম্।
বিজ্ঞনীয়াত্তস্যমৃত্যুঃ ষণ্মাসাভ্যন্তরে ধ্রুবম্॥

যাহার রাত্রিকালে নিয়ত বাম নাসিকায় এবং দিবাভাগে দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাস বহন হয়, তাহার ৬ ছয় মাস মধ্যে মৃত্যু হয়।

প্রতিকারের উপায়

শেশাঙ্ক বারয়েদ্রাত্রৌ দিবা কার্য্য দিবাকরঃ।

সমস্ত রাত্রি যদি দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাস বহন না হইয়া কেবল বাম নাসিকায় বহন হয়; কিম্বা দিবাতে একবারও বাম নাসিকায় শ্বাস বহন না হইয়া কেবল দক্ষিণ নাসিকায় বহন হয়, তাহা হইলে পুরাতন তুলা দ্বারা দিবাতে দক্ষিণ নাসিকা বন্ধ রাখিবে, সন্ধ্যার সময় দক্ষিণ নাসিকা হইতে তুলা খুলিয়া লইয়া তদ্দারা বাম নাসিকা সমস্ত রাত্র বন্ধ করিয়া রাখিবে। ইহাতে মৃত্যুর সময় পরিবর্ত্তন হইয়া যায়।

(২২)

অরুন্ধতীং ধ্রুবঞ্চৈব বিষ্ণোস্ত্রীণি পদানি চ।
আয়ুর্হীনা ন পশ্যন্তি চতুর্থং মাতৃমণ্ডলম্॥

যাহাদের মৃত্যু নিকটবর্ত্তী তাহারা আকাশে অবস্থিত

সপ্তর্ষিমণ্ডল মধ্যগত অরুন্ধতী ও ধ্রুব নক্ষত্র, বিষ্ণুপদত্রয় এবং মাতৃমণ্ডল নামক তারা দেখিতে পায় না।

স্বনাম বিখ্যাত এই নক্ষত্রগুলি অনেকেই চিনেন। কৃষ্ণ-পক্ষের রাত্রে স্পষ্ট দৃষ্ট হয়। আমরা বাল্যকালে দেখিয়াছি যে, প্রাচীনগণ প্রায় সকলেই রাত্রে ঐ নক্ষত্র কয়টী চিনিতেন এবং প্রায়ই রাত্রে ঐ সকল দেখিয়া আয়ু পরীক্ষা করিতেন।

এখনকার নব্য শিক্ষিতগণ যাহারা প্রাচীনদিগের বিদ্যা বুদ্ধির ও প্রাচীন প্রথার নিন্দা করিয়া পাশ্চাত্য শিক্ষা, দীক্ষা, চাল চলনের পক্ষপাতী তাহারা আকাশে এবং নিজ দেহে পরীক্ষা করিলে প্রত্যক্ষ ফল দেখিতে পাইবেন।

বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডে আকাশ, নক্ষত্র, নদ নদী, তীর্থ প্রভৃতি ক্ষুদ্র বৃহৎ যে সমস্ত বস্তু বিদ্যমান রহিয়াছে, তৎসমস্তই মনুষ্যদেহে আছে। এই জন্য মানবদেহকে ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড বলে। আকাশস্থিত নক্ষত্রের ন্যায় মানবের শরীর মধ্যে নাসিকা, ভ্রূ ও জিহ্বা প্রভৃতি পৃথক পৃথক নাম আছে। যথা :—

অরুন্ধতী ভবেদ জিহ্বা ধ্রুবোনাসাগ্রমুচ্যতে।
ভ্রুবোর্মধ্যে বিষ্ণুপদং তারকং মাতৃমণ্ডলম্॥

জিহ্বার নাম অরুন্ধতী, নাসিকার অগ্রভাগ ধ্রুব, ভ্রূযুগলের মধ্যভাগ বিষ্ণুপদ, চক্ষুর তারা মাতৃমণ্ডল অভিহিত হয়।

আসন্নমৃত্যু ব্যক্তি যেমন আকাশপদস্থিত অরুন্ধতী, বিষ্ণুপদ, মাতৃমণ্ডল ও ধ্রুব নামক নক্ষত্র দেখিতে পায় না; সেইরূপ নিজ

দেহস্থিত নাসার অগ্রভাগ ও জিহ্বার অগ্রদেশ এবং ভ্রূদ্বয়ের মধ্য ও চক্ষুর তারা দেখিতে পায় না।

জিহ্বার অগ্রভাগাদি নিজে নিজে সহজে দেখা যায়, কিন্তু চক্ষুর তারা অর্থাৎ মাতৃমণ্ডল সহজে দেখা যায় না। চক্ষুর তারা (মাতৃমণ্ডল) দেখিবার একটি কৌশল আছে। পাঠকগণের অবগতির জন্য তাহা বলিতেছি।

(২৩)

কোণমম্মোঽঙ্গুলীভ্যাস্তক্ষিঞ্চিৎপীত্যনিরীক্ষয়েৎ।
যদি ন দৃশ্যতে বিন্দুর্দশাহেন সনোমৃতঃ।

চক্ষু মুদ্রিত করিয়া একটি অঙ্গুলীর অগ্রভাগ দ্বারা চক্ষুর কোণ ঈষৎ চাপিয়া পীড়িত করিলে তদ্বিপরীত দিকে চক্ষুর তারার আকৃতি একটি গোল জ্যোতিঃ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাই মৃত্যুর দশ দিন পূর্ব্ব হইতে ঐ জ্যোতি আর দেখা যায় না।

(২৪)

দক্ষিণ হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া নাকের সমান মস্তকের উপর কিম্বা ভ্রূর ঊর্দ্ধে কপালের উপর বদ্ধমুষ্টি রাখিয়া নাসিকার সম্মুখে হাতের কব্জীর নীচে সমানভাবে দৃষ্টি স্থাপন করিলে হাত খুব সরু দেখা যায়, ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম। কিন্তু মৃত্যুর ছয় মাস পূর্ব্বে ঐরূপ সরু না দেখাইয়া ঐ স্থান

ফাঁক দেখা যাইবে। অর্থাৎ বোধ হইবে হাতের সহিত মুষ্টির যোগ নাই ; হাত হইতে মুষ্টি বিভিন্ন ; এরূপ যে দিন দেখা যাইবে, সেই দিন হইতে ছয় মাস মাত্র আয়ু অবশিষ্ট আছে বুঝিতে হইবে।

(২৫)

যে মনুষ্যের স্তনের চর্ম্ম অসাড় হয়, সেই ব্যক্তি পাঁচ মাস অন্তে যমালয়ে যাইবে

(২৬)

দন্তশ্চবৃষণৌ হস্ত ন কিঞ্চিদপি পীড্যতে।
তৃতীয়ং মাসমাবশ্যং কালাজ্ঞয়া ভবেন্নরঃ॥

(শিব—স্বরোদয়।)

যে ব্যক্তির দন্ত ও কোষ টিপিলে কিছুমাত্র বেদনা অনুভব না হয়, সেই ব্যক্তি তিন মাস মধ্যে যমরাজের অধীন হইবে।

(২৭)

মধ্যমাঙ্গুলিনাং ত্রিতয়ং বক্রং।
রোষাং বিনা শুষ্যতি যস্য কণ্ঠঃ॥
মরণং তস্য নির্দ্দিষ্টং ষণ্মাসেন নিশ্চিতম্॥

(শিব—স্বরোদয়)

. যাহার তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা এই তিন অঙ্গুলি পীড়া ব্যতীত নিম্নদিকে বাঁকিয়া পড়ে এবং কোন রোগ বিনা সর্ব্বদা কণ্ঠ শুষ্ক হয়, সে ব্যক্তি ছয় মাস মধ্যে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইবে।

(২৮)

বাপ্যং পুরীষ মুত্রাণি সুবর্ণ রজতং তথা।
প্রত্যক্ষমথবা স্বপ্নে দশ মাসান্ন জীবিত ॥

(শিব—স্বরোদয়।)

যে মনুষ্য জাগ্রত কিম্বা নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্নে মল, মূত্র, সুবর্ণ কি রৌপ্যের ন্যায় দর্শন করে, সেই ব্যক্তি দশ মাসের অধিক বাঁচে না।

(২৯)

লক্ষং লক্ষিত লক্ষণেম সলিলে
ভানুর্যদা দৃশ্যতে ক্ষীণো দক্ষিণে
পশ্চিমোত্তর পুরঃ ষটত্রি দ্বিমাসৈকতঃ।
মধ্যং ছিদ্রমিদং ভবেদ দশদিনং
ধুমাকুলং তদ্দিনে সর্ব্বজ্ঞৈরপি
ভাষিতং মুনিবরৈরায়ুঃ প্রমাণং স্ফুটম ॥

সর্ব্বজ্ঞ মুনিবর বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি জলের মধ্যে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব ক্ষীণ দক্ষিণাদি দিকে দেখে সে ব্যক্তি ছয়, তিন, দুই ও এক মাস বাঁচিবে। অর্থাৎ সূর্য্যের প্রতিবিম্বের দক্ষিণ দিকে যদি কটা রং দেখে তবে ছয় মাস, আর পশ্চিম দিকে কটা দেখে তো তিন মাস, উত্তর দিকে কটা দেখে তবে দুই মাস, আর পূর্ব্বদিকে দেখিলে একমাস পরমায়ু আছে বুঝিতে হইবে। আর প্রতিবিম্বের মধ্যে ছিদ্র দেখিলে দশ দিন মধ্যে এবং সম্পূর্ণ প্রতিবিম্ব ধুম্রবর্ণ দেখিলে সেই দিনই মৃত্যু হইবে।

স্বপ্নফল

মৃত্যুর পূর্ব্বে যেমন শারীরিক বিকার ও নানাবিধ লক্ষণ প্রকাশ হয়, তেমনি মরণের পূর্ব্বে অরিষ্টজনক অনিষ্টকারী স্বপ্ন দৃষ্ট হইয়া থাকে। অনেকে বলেন যে, স্বপ্ন সকল অমূলক চিন্তা মাত্র, কোন কার্য্যকরী নহে। একথা কোন মতেই স্বীকার করিতে পারি না, সামবেদের কোন শাখায় সুস্বপ্ন বর্ণিত আছে, তাহা একেবারে মিথ্যা কল্পনাপ্রসূত বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। যখন বেদ, আয়ুর্ব্বেদ, তন্ত্র, জ্যোতিষ এবং স্বরোদয় প্রভৃতি শাস্ত্রে শুভ ও অশুভজনক স্বপ্নের বিষয় বর্ণিত আছে, তখন স্বপ্ন মিথ্যা নহে। শাস্ত্রবাক্য ব্যতীতও প্রত্যক্ষ দেখা যায় যে, অনেকেই স্বপ্নে ঔষধ প্রাপ্ত হইয়া রোগমুক্ত হইয়াছেন। এরূপ ঘটনা বিরল নহে।

বাল্যকালে কোন পুস্তকে পড়িয়াছি—"স্বপ্ন সকল অমূলক চিন্তা মাত্র।" একথা অভ্রান্ত সত্য জ্ঞানে হৃদয়ে দৃঢ়বদ্ধ ছিল। সেই সময় বৃদ্ধ বিজ্ঞগণের কথা অবজ্ঞা করিয়া উড়াইয়া দিয়াছি। কিন্তু অদৃষ্টচক্রের আবর্ত্তনে মতিগতির পরিবর্ত্তনে গুরুদেবের কৃপায় শাস্ত্রমাহাত্ম্যে ও কার্য্যকারণের প্রত্যক্ষ ফলে পূর্ব্বের সংস্কার সব দূর হইয়া গিয়াছে। সুতরাং এখন বলিতে পারি না স্বপ্ন সকল অমূলক চিন্তা মাত্র ও কোন কার্য্যকরী নহে। প্রকৃত প্রস্তাবে এখন জোর করিয়া বলিতে পারি, স্বপ্ন অনেক

ক্ষেত্রে মনুষ্য জাগ্রত অবস্থায় যে বিষয়ের চিন্তা করে এবং যাহা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে ; সেই বিষয় অবিকল অথবা ভিন্ন ভিন্ন আকারে প্রকারে স্বপ্ন দেখিয়া থাকে। আবার কোন মিল নাই, সামঞ্জস্য নাই, ভিন্ন ভিন্ন স্থান, বিভিন্ন লোক ও বিভিন্ন কার্য্য স্বপ্ন দেখিয়া থাকে। যাহা কোন দিন চিন্তা করে নাই, যাহা কোন দিন পূর্ব্বে দেখে নাই, এরূপ অজ্ঞাত বিষয় সচরাচর স্বপ্নে দেখিয়া থাকে ; সকল স্বপ্ন সফল হয় না বটে ; কিন্তু অনেক স্বপ্ন সফল হইয়া থাকে। স্বপ্ন কেন হয়, সত্য ও মিথ্যা ফল দেখা যায়, ইহার কারণ নির্ণয় করিতে বিজ্ঞান এখনও পারে নাই। যোগীরা বলেন যে, ঘুমের মধ্যে যখন ইন্দ্রিয় সমুদয় বিজ্ঞানময় পুরুষে লয় প্রাপ্ত হয় এবং বিজ্ঞানময় পুরুষ হৃদয়-কমলের আবরণ স্বরূপ "পুরীতৎ" নাম্নী নাড়ীতে পরিভ্রমণ করিতে থাকেন, এইরূপ সময় স্বপ্নাবস্থা এবং এই সময় জীব স্বপ্ন দেখিয়া থাকে।

স্বপ্নের অর্থ আছে, ইহা পূর্ব্বকালে সকল দেশেই বিশ্বাস করিত। ভারতবর্ষে হিন্দু-রাজদরবারে স্বপ্ন-অর্থ নির্ণয় করিবার জন্য স্বপ্নার্থবিৎ পণ্ডিত নিযুক্ত থাকিত। রোম, মিসর, গ্রীক্ প্রভৃতির ইতিহাসে স্বপ্নার্থবিৎ পণ্ডিতের উল্লেখ আছে। আমাদের দেশে তন্ত্র, পুরাণ, জ্যোতিষ ও স্বরশাস্ত্রে স্বপ্নার্থ নির্ণয় আছে।

কোন অবস্থায় দৃষ্ট স্বপ্ন সত্য হয় এবং কোন অবস্থায় দৃষ্ট স্বপ্ন সত্য হয় না ; কত দিন পরে স্বপ্নের ফল ফলিবে এবং স্বপ্ন

দেখার পরে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সমস্ত শাস্ত্রে বর্ণিত আছে সাধারণের অবগতির জন্য সংক্ষেপে তাহা বলিতেছি ।

পীড়িতাবস্থায় এবং ধাতু বিকার হেতু স্বপ্ন দেখা যায়। এরূপ অবস্থায় ও দিবাভাগে নিদ্রিতাবস্থায় যে স্বপ্ন হয়, তাহার ফল হয় না।

চিন্তাব্যাধি সমাযুক্তো নরঃ স্বপ্নঞ্চ পশ্যতি
তৎসর্ব্বপ্নং নিষ্ফলং তাত প্রয়াতোবঃ ন সংশয়ঃ
জ্বরো মুত্র পুরীষেণ পীড়িতশ্চ ভয়াকুলঃ
দিগম্বরো মুক্তকেশো ন লভেৎ স্বপ্নজং ফলঃ ॥

চিন্তাব্যাধি সমাযুক্ত যে ব্যক্তি স্বপ্ন দর্শন করে তাহার ফল হয় না। মূত্র পুরীষপীড়িত ভয়াকুলিত চিত্ত মুক্তকেশ এবং নিদ্রিতাবস্থায় পরিধেয় কাপড় খুলিয়া গেলে অথবা দিগম্বর হইয়া শয়ন করিলে যে স্বপ্ন দেখা যায় তাহার ফল নিষ্ফল হয় ।

দৃষ্টা স্বপ্নাঞ্চ নিদ্রালু যদি নিদ্রাং প্রয়াতি চ
ন লভেৎ স্বপ্নজং ফলং।
উক্তা কাশ্যপগোত্রেচ বিপত্তিং লভতে ধ্রুবং ॥
ন প্রকাশ্যশ্চ সুস্বপ্ন প্রাপ্তিভৈং কাশ্যপে ব্রজ॥

স্বপ্ন দর্শনের পর পূনঃ নিদ্রিত হইলে এবং কাশ্যপ গোত্রজ ব্যক্তির নিকট স্বপ্নের বিষয় বলিলে সে স্বপ্নের ফল হয় না।

তন্ত্রাদি নানা শাস্ত্রে স্বপ্নের ফল বর্ণিত আছে, তন্মধ্যে স্বর-শাস্ত্রে সম্মত এবং যদ্দারা যোগীরা আপনার মৃত্যু জানিতে পারেন, সেইগুলি মাত্র বর্ণন করিতেছি।

মৃত্যুসূচক স্বপ্ন

১। যে ব্যক্তি রক্তবর্ণ ও শুভ্রবর্ণ রস কি বিষ্ঠা মূত্র বমি হওয়ায় স্বপ্ন দর্শন করে, সে ব্যক্তির দশ মাস আয়ু অবশিষ্ট আছে বুঝিতে হইবে।

২। কোন স্ত্রীলোক কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্র কিম্বা রক্তবর্ণ বস্ত্র পরিধান করিয়া হাসিতে হাসিতে দক্ষিণ দিকে লইয়া যাইতেছে এরূপ স্বপ্ন দেখিলে জানিবে যে, সে ব্যক্তির মরণ নিকট হইয়াছে।

৩। ভয়ানক কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ অস্ত্র উদ্যত করিয়া কিম্বা প্রস্তরঘাতে বধ করিতে আসিতেছে, এরূপ স্বপ্ন দেখিলে সেই দিনেই মৃত্যু হইবে।

৪। উলঙ্গ সন্ন্যাসী নাচিতেছে, হাসিতেছে, ক্রূর দৃষ্টিতে চাহিতেছে, এরূপ স্বপ্ন দেখিলে ভোগ সুখের আশা পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মকার্য্যে রত হইবে।

৫। কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ কৃষ্ণবস্ত্র পরিধান ও লৌহদণ্ড ধারণ করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে এরূপ স্বপ্ন দেখিলে, তিন মাসের মধ্যে যমালয়ে যাইতে হইবে।

৬। যে ব্যক্তি স্বপ্নে কৃষ্ণাবর্ণা রমণীকে বাহুপাশে বদ্ধ করে, সে ব্যক্তি ছয় মাস পরে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়।

৭। আপনার শরীর গন্ধ পুষ্পাদি দ্বারা ভূষিত হইয়াছে, এরূপ স্বপ্ন দেখিলে আট মাসের অধিক বাঁচিবার আশা নাই, নিশ্চয় জানিবে।

৮। ভস্মরাশি কি বাল্মীকের উপর দাঁড়াইয়া আছে, এরূপ স্বপ্ন দেখিলে আট মাস আয়ু অবশিষ্ট আছে জানিবে।

৯। আপনার মস্তকে কি গাত্রে শুষ্ককাষ্ঠ অথবা তৃণ রহিয়াছে, এরূপ স্বপ্ন দেখিলে বুঝিবে আর ছয় মাস মাত্র জীবিত থাকিবে।

১০। শৃগাল, শূকর, শকুনি, রাক্ষস, অসুর, পিশাচ, ভূত, প্রেত, পতঙ্গ কুরঙ্গ কিম্বা শোল পক্ষী, ইহাদের মধ্যে কেহ তাহাকে দংশন করিতেছে, কি ভক্ষণ করিতেছে এরূপ স্বপ্ন দর্শন করিলে এক বৎসরান্তে নিশ্চয় শমন ভবনে গমন করিতে হইবে।

১১। নিজের সমস্ত দাঁত পড়িয়া গিয়াছে, যদি এরূপ স্বপ্ন দেখা যায়, তাহা হইলে মৃত্যুর বিলম্ব নাই বুঝিতে হইবে।

১২। বানর পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া পূর্ব্বদিকে যাইতেছে, এরূপ স্বপ্ন দেখিলে পাঁচ দিনের মধ্যে যমালয়ে যাইতে হইবে সন্দেহ নাই।

১৩। গর্দ্দভ কিম্বা মহিষের পৃষ্ঠে উঠিয়া দক্ষিণ দিকে

যাইতেছি, এরূপ যে ব্যক্তি দর্শন করে তাহার মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইয়া অনতিবিলম্বে তীর্থস্থানে যাওয়া উচিত।

মৃত্যুসূচক স্বপ্ন সমস্তই এক ব্যক্তির দৃষ্ট হয় না। স্বপ্নগুলির মধ্যে কোন কোন স্বপ্ন কেহ কেহ দেখিয়া থাকেন। ফল কথা সকলেই মৃত্যুসূচক স্বপ্ন দেখিয়া থাকে সন্দেহ নাই ; কিন্তু ফলাফল না জানা বশতঃ কেহবা অগ্রাহ্য করিয়া সপ্নে বিশ্বাস করে না এবং তৎপ্রতি লক্ষ্যও রাখে না।

মৃত্যুর পূর্ব্বে অরিষ্টসুচক যে সকল শারীরিক লক্ষণ প্রকাশ হয় তাহা প্রথমে বলিয়াছি। ঐ লক্ষণগুলির প্রথমাংশে বর্ণিত কোন লক্ষণ কাহার শরীরে প্রকাশ না হইলেও ১৫ হইতে ২৪ নম্বর পর্য্যন্ত লক্ষণগুলি প্রত্যেক ব্যক্তির অনুভব হইবে, ইহা স্থির নিশ্চয়। ঐ লক্ষণগুলি নিশ্বাসের গতি দেখিয়া বুঝিতে হয়, কিন্তু নিশ্বাসের গতি ও শ্বাসের পরিচয় কেহই জানে না। (শ্বাসের গতি সম্বন্ধে গুরুবাক্য "প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগে" বিস্তারিত লিখিত আছে)। এই জন্য যদি কেহ নিশ্বাসের গতি বুঝিতে না পারেন তাহা হইলে ২৩ ও ২৪ নম্বরের লক্ষণ দুইটি সকলেই স্ব স্ব দেহে বুঝিতে পারেন।

২৩ ও ২৪ নম্বরের লক্ষণ সকলের শরীরেই প্রকাশ হইবে। এই লক্ষণ বুঝিবার জন্য কাহার নিকট বিদ্যা বুদ্ধি ধার করিতে হইবে না, এবং কোন অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে না।

চব্বিশ নম্বর চিহ্ন যে দিন দেখা যাইবে, সেই দিন হইতে ছয় মাস পূর্ণ হইলে মৃত্যু হইবে। ঐ লক্ষণ প্রকাশ

হওয়ার পরে প্রত্যহ প্রাতে চক্ষের কোণে অঙ্গুলী দ্বারা নাড়িয়া (২৩ নম্বরের লিখিত) মাতৃমণ্ডল যে দিন দেখা না যাইবে, সেই দিন হইতে দশ দিনের মধ্যে যমালয়ে যাইতে হইবে।

যে সমস্ত অরিষ্ট লক্ষণ প্রকাশ করিলাম তাহার মধ্যে ঐ দুটি লক্ষণ সকল ব্যক্তির শরীরে প্রকাশ হয় এবং সকলেই নিজে নিজে নিজ দেহে পরীক্ষা করিয়া বুঝিতে পারিবেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে লক্ষণ বুঝিতে পারিলে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হওয়া অতি কর্ত্তব্য। কিন্তু ধন-সম্পদ ও বিষয় বিভব রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এবং স্ত্রী-পুত্রাদির ভাবনা ভাবিয়া অসার মায়ামোহে মুহ্যমান হইয়া আসল কথা ভুলিবেন না। অর্থাৎ পরজন্মে আবার যাহাতে মানবদেহ প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বপ্রকার সুখ-শান্তি ভোগ করা যায় তাহার জন্য প্রস্তুত হওয়া অতি কর্ত্তব্য। কিন্তু প্রস্তুত হইবার ২টি উপায় আছে। একটি দান; অপরটি তপস্যা।

ভাবিবার বিষয়

একবার ভাবিয়া দেখিবেন যে, কত পরিশ্রম, কত কষ্ট করিয়া ধন উপার্জ্জন করিয়া সঞ্চয় করিরাছেন। আপনি মরিয়া গেলে স্ত্রী-পুত্রাদি অর্থের জন্য কষ্ট পাইবে না, সুখে থাকিবে এই আশায় অর্থ সংগ্রহ ও ভোগবিলাস করিয়াই জীবন কাটাইয়াছেন। কিন্তু আপনি যখন সেই অজ্ঞাত প্রদেশে চলিয়া যাইবেন, তখন পথখরচ বলিয়াও একটি পয়সা সঙ্গে লইয়া যাইতে পারিবেন না। স্ত্রীপুত্রাদি কেহই তো সঙ্গে

যাইবে না। সঙ্গে যাইবে কেবল আপনার কর্ম্ম এবং কর্ম্মানু-যায়ীই ফলপ্রাপ্ত হইবেন। এখানে অধর্ম্ম করিয়া যে সকল পাপ করিয়াছেন, তাহার জন্য যখন শাস্তি ভোগ করিবেন, তখন স্ত্রী, পুত্র, ধন, জন, লোক লস্কর কাহারও দ্বারা কোন উপকার পাইবেন না। নিজেই কেবল যন্ত্রণা ভোগ করিয়া চক্ষুর জলে বক্ষ ভাসাইবেন। এই যে অধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া, পরের অনিষ্ট করিয়া অর্থ উপার্জ্জন ও সঞ্চয় করিয়াছেন ; এখন ঐ অর্থ দ্বারা আপনার কোন উপকার হইবে না। আর অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে যে অধর্ম্ম করিয়াছেন তাহার জন্য তীব্র যাতনা ভোগ করিবেন। হায়! এমন সাধের অর্থ তাহার এক কপর্দ্দকও সঙ্গে যাইবে না।

বরং দারিদ্র্যমন্যায়, প্রভাবাদ বিভবাদপি।
ক্ষীণতা পানতা দেহে পানতা নতুরোগজা॥

বরং দরিদ্র হইয়া দুঃখে থাকা ভাল তথাপি অন্যায় উপায়ে বিভবশালী হওয়া ভাল নয়। সুস্থ ক্ষীণ শরীরও ভাল তথাপি রোগে ফুলিয়া মোটা হওয়া ভাল নহে। সুতরাং অন্যায় উপায়ে ধন উপার্জ্জন করা অকর্ত্তব্য।

হায়! এমন সাধের অর্থ ; তাহার এক কপর্দ্দকও সঙ্গে যাইবে না। এই শাস্ত্রে বলিয়াছেন—

এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেহপ্যনুযাতি যঃ।
শরীরেণ সমং নাশং সর্ব্বমন্যত্তু গচ্ছতি॥

অর্থাৎ ধন, মান, বিষয়, আশয়, স্ত্রী-পুত্র, বন্ধু বান্ধব সকলই শরীরের সহিত নষ্ট হইয়া যায়। ধর্ম্মই কেবল একমাত্র সুহৃদ কেন না, ধর্ম্ম মৃত্যুর পরেও আমাদের সঙ্গে গমন করেন।

শাস্ত্রে আরও বলিয়াছে যে, ধনই বল আর জীবনই বল, পদ্ম-পাত্রের মধ্যে জলবিন্দুর ন্যায় সকলই চঞ্চল। অতএব ধর্ম্মাচরণ কর। শ্রুতি স্মৃতিতে যে বিহিত ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট আছে, মনুষ্য যদি তদনুযায়ী কার্য্য করে, তাহা ইহকালে কীর্ত্তি ও পরকালের অনন্ত সুখের অধিকারী হয়। এই সুদুর্লভ মানবদেহ ধারণ করিয়া যে ব্যক্তি ধর্ম্মোপার্জ্জন করিতে পারিল না, তাহার জীবন বৃথা এবং সে ব্যক্তি ইহ-পরকালে দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে।

আদিত্য পুরাণে ব্যক্ত আছে—

মনুষ্যং যঃ সমাসাদ্য স্বর্গ মোক্ষ প্রদায়কম্।
দ্বয়োর্ন সাধয়ত্যেকং স মৃতস্তপ্যতেচিরম॥

স্বর্গ-মোক্ষপ্রদায়ক মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করিয়া যে ব্যক্তি দু'য়ের একটীও সাধনা না করিল, সে মৃত্যুর পর দারুণ অনুতাপগ্রস্ত হয়।

মহাভারতে আছে যে—

যস্যত্রিবর্গ শূন্যস্য দিনান্যায়ান্তি যন্তি চ।
স লোহাকার ভস্ত্রেব স সন্নিপ ন জীবতি॥

ধর্ম্মোপার্জ্জনাদি না করিয়া যে ব্যক্তির দিন আসিতেছে ও যাইতেছে; কর্ম্মকারের ভস্ত্রা যেমন বৃথা নিশ্বাস প্রশ্বাস ফেলিয়া থাকে, সে ব্যক্তিও সেইরূপ বৃথা জীবিত থাকে।

মহাভারতে আরও বলিয়াছেন—

বিদ্যাবিত্তং বপুঃ শৌর্য্যং কুলে জন্মনিরোগিতা।
সংসারোচ্ছিত্তি হেতুশ্চ ধর্ম্মাদেব প্রবর্ত্ততে ॥

বিদ্যা, বিত্ত, দেহ, শৌর্য্য, কুলিন ও শ্রেষ্ঠ বংশে জন্মগ্রহণ করা, দেহ অরুগ্ন থাকা, সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া সকলই ধর্ম্ম হইতে প্রসূত হয়।

ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিলে ইহ-পরকালে সুখ হয় এবং অধার্ম্মিক লোক দুঃখ ভোগ করে, ইহাতে সন্দেহ নাই। কর্ম্মানুরূপ ফল ভোগ যদি না করিতে হইত তাহা হইলে সংসারে ধর্ম্ম ও পুণ্যের নাম গন্ধও বিদ্যমান থাকিত না। সকলেই পাশব আচরণে ইন্দ্রিয় সুখ সম্ভোগ ও অসৎ বাসনা পূর্ণ করিতে থাকিত।

এখন কথা এই যে, এই ধর্ম্ম কিসে হয়? কলিযুগে গৃহস্থের পক্ষে দান একমাত্র ধর্ম্ম। ন্যায়ানুমোদিত উপার্জ্জিত অর্থের কিছু অংশ দান করিতে হইবে। অর্থাৎ যাহার যেমন আর্থিক অবস্থা, তিনি তদনুরূপ দান করিবেন। তাহা বলিয়া তুমি ধর্ম্মের মস্তকে বজ্রাঘাত ও ন্যায়ের মস্তকে পদাঘাত পূর্ব্বক একজনের সর্ব্বনাশ করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিলে কিংবা চাকুরী করিতে গিয়া মনিবের চক্ষে ধূলি দিয়া অর্থ সংগ্রহ করিয়া কিঞ্চিৎ দান করিলে অথবা সেই অর্থে দশজন লোক খাওয়াইলে অর্থাৎ তোমার নিমকহারামী ও অধর্ম্ম-প্রাণোদিত ও ভদ্রতার

বহির্ভূত অন্যায় উপার্জ্জিত অর্থ দ্বারা দানাদি করিলে, তোমার কোনই উপকার হইবে না। ধর্ম্মসঙ্গত ন্যায় উপার্জ্জিত অর্থ সার্থক, তাহার কিছু অংশ দান করিতে হইবে।

যাহারা বাহিরে ধর্ম্মের কৃত্রিম আবরণে আবরিত, ভিতরে নিত্য বাহিরে অধর্ম্মের পৈশাচিক নৃত্য ;—এরূপ দুর্ব্বুদ্ধিসম্পন্ন এমন অনেক লোক দেখিয়াছি যে, তাহারা অন্ধ, খোঁড়া ও রোগগ্রস্ত দুর্দ্দশাপন্ন বিপন্ন ব্যক্তিকে দান করে না। তাহারা বলিয়া থাকে, উহারা পাপী। ভগবান যখন উহাদিগকে দণ্ড দিতেছেন তখন আমরা সাহায্য করি কেন ? উহাদিগকে দান বা কোন প্রকার সাহায্য করিলে ভগবানের বিধির বিরুদ্ধাচরণ এবং অপ্রিয় কার্য্য করা হয়। ইহা কিন্তু বর্ত্তমান যুগের নব্য শিক্ষিতদের বিবেক বুদ্ধিসম্মত। (এই বিষয় আমি স্বকর্ণে দুই একজন ডেপুটী মুনসেফের মুখে শুনিয়াছি) এই নজীর দেখাইয়া অনেকে মুষ্টিভিক্ষা পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়া বাজে খরচ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছেন। কিন্তু আধুনিক বিবেকবাদীগণ নিজের নির্ব্বুদ্ধিতা বশতঃই তপপরায়ণ ঋষি প্রণীত শাস্ত্র অবিশ্বাস করিয়া প্রত্যব্যয় ভাগী হইতেছেন। প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইতে হইলে শাস্ত্রের আশ্রয় এবং শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস ব্যতীত অন্য গতি নাই। যাহারা ধর্ম্মকর্ম্ম স্বেচ্ছাচার মত পোষণে প্রয়াসী এবং শাস্ত্রবাক্যে অবিশ্বাসী, যাহারা শাস্ত্রবাক্য উপেক্ষা করিয়া চঞ্চল বুদ্ধি কর্ত্তৃক চালিত হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করে, তাহারা ইহলোকে সুখ ও পরলোকে উত্তমগতি প্রাপ্ত হয় না।

এই বিষয় গীতায় ভগবান বলিয়াছেন—

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামকারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্॥

(গীতা ১৬শ অঃ)

যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বেচ্ছাচারী হইয়া কার্য্য করে তাহার চিত্তশুদ্ধি হয় না; তাহার ইহলোকে সুখ ও পরলোকে উত্তমগতি লাভ হয় না—অর্থাৎ তাহার ইহকালও নাই, পরকালও নাই।

অতএব যাহারা নিজের স্বেচ্ছাচারী ধর্ম্মমতের অসার ভিত্তি অবলম্বন করিয়া শাস্ত্র অবহেলা করিয়া দান করিতে পরাঙ্মুখ তাহাদের ভগবানের এই মহাবাক্য সর্ব্বদা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। দয়াতেই ধর্ম্মের অবস্থিতি। লোকের কষ্ট ও দুর্দ্দশা দেখিয়া যদি তোমার মনে দয়ার উদয় না হয় এবং দান ও সাহায্য করিতে প্রবৃত্তি না হয়, তবে তোমার ধর্ম্ম কোথায়? যাহার দয়া নাই, তাহার ধর্ম্মও নাই। মানুষের মন বুদ্ধি প্রভৃতি অন্তঃকরণ সত্ত্ব, রজঃ তম এই ত্রিগুণের দ্বারা গঠিত। সুতরাং তাহার কার্য্যাকার্য্য বিচারে শক্তি কোথায়? জীবের বুদ্ধি নিজ সংস্কারানুরূপ গঠিত। এ কারণ সর্ব্বসংস্কার বর্জ্জিত তত্ত্বজ্ঞ ঋষিগণের প্রণীত শাস্ত্রানুসারে অন্ধ, খোঁড়া, দীন দুঃখী ও তপস্বীদিগকে দান করা কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি পাপের ফলে দণ্ডভোগ করিতেছে, সে ত কর্ম্মানুরূপ ফলভোগ করিবেই, সে তেমনি ফলভোগ করিবে।—এ কথা তো

পড়িয়াই আছে, তুমি অপরের দোষগুণ—কর্ম্মাকর্ম্ম বিচার না করিয়া তোমার কর্ত্তব্য তুমি কর। দান গৃহস্থাশ্রমের একটা প্রধান ধর্ম্ম, তখন তোমার অবস্থানুরূপ দান করিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান কর।

তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্য ব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্ম কর্ত্তুমিহার্হসি॥

গীতা ১৬শ অ:)

কার্য্যাকার্য্য নিরূপণে শাস্ত্রই তোমার প্রমাণ। অতএব শাস্ত্রানুসারে নিজ অধিকার মত শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা জ্ঞাত হইয়া কর্ত্তব্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হও। যুগ বিশেষে লোকের মতিগতি ও দেহানুরূপ ধর্ম্ম ও কর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এবং সকল শাস্ত্র এক-বাক্যে বলিতেছে কলিযুগে দানই পরম ধর্ম্ম।

যথা মনু বলিয়াছেন—

তপঃ পরং কৃতেযুগে ত্রেতায়াং জ্ঞানমুচ্যতে।
দ্বাপরে যজ্ঞমিত্যাহুর্দানমেকং কলৌযুগে॥

সত্যযুগে তপস্যা, ত্রেতাযুগে জ্ঞান, দ্বাপরযুগে যাগযজ্ঞ নির্দ্দিষ্ট ছিল। কলিযুগে মনুষ্য অল্পায়ু অল্পজ্ঞানী ; অতএব দান একমাত্র ধর্ম্ম।

বৃহস্পতি বলিয়াছেন—

তপোধর্ম্মঃ কৃতে যুগে জ্ঞানং ত্রেস্কাযুগে স্মৃতং
দ্বাপরে চর্ব্বরাঃ প্রোক্তাঃ কলৌদানং দয়াদমঃ॥

তপস্যা সত্যযুগের ধর্ম্ম ; ত্রেতাযুগের ধর্ম্ম জ্ঞান ; দ্বাপরের ধর্ম্ম যজ্ঞ, কলিতে দান, ও দয়াই ধর্ম্ম ।

যম বলিয়াছেন —

যতীনাস্তু শমোধর্ম্মস্তনাহারো বনৌকসাং ।
দানমেব গৃহস্থানাং শুশ্রূষা ব্রহ্মচারিণাং ॥

শম যতিদিগের ধর্ম্ম ; অনাহার বনৌকসের ধর্ম্ম ; দান গৃহস্থাশ্রমের ধর্ম্ম ; ব্রহ্মচারীদিগের ধর্ম্ম গুরুসেবা ।

যাজ্ঞবল্ক্য মুনি বলিয়াছেন—

দাতব্যং প্রাত্যহং পাত্রে নিমিত্তেষু বিশষতঃ ।
যাচিতে নাপি দাতব্যং শ্রদ্ধাপুতস্তু শক্তিতঃ
প্রতিদিন শ্রদ্ধাপুত চিত্তে যাচককে দান করিবে

মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে বলিয়াছেন—

কলৌ দানমহেশানি সর্ব্বসিদ্ধিকরং ভবেৎ ।
অর্থাৎ কলিযুগে একমাত্র দানই সমুদায় সিদ্ধির কারণ ।

দানং হি সর্ব্বব্যসনানি হন্তি ।

যত অমঙ্গল আছে সকলই দানে নষ্ট হয় ।

সর্ব্বশাস্ত্রবিদ বেদব্যাস বলিয়াছেন যে, “যাচককে আমি গুরু বলিয়া মান্য করি । কারণ যাচক কর্ত্তৃক মনোবল পরিমার্জ্জিত হইয়া থাকে । আর যে অর্থে ধর্ম্ম নাই, কীর্ত্তি

নাই, যাহা পরিত্যাগ করিয়া ইহসংসার হইতে প্রস্থান করিতে হইবে, দান ব্যতীত সে অর্থের প্রয়োজন কি? প্রাণ হইতে প্রিয়তম অর্থের সদগতি একমাত্র দান দ্বারাই হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি তপস্বীদিগকে অর্থ দান করে, সে আপনারই পারলৌকিক সংস্থান করিয়া রাখে।

ধর্ম্মের নানা লক্ষণ শাস্ত্রগ্রন্থে ব্যক্ত থাকিলেও কলিযুগে দান ধর্ম্মই যে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম এবং স্বর্গ ও মোক্ষের নিদান তাহাতে সন্দেহ নাই।

ন দানাদধিকং কিঞ্চিদ্ দৃশ্যতে ভুবনত্রয়ে।
দানেন প্রাপ্যতে স্বর্গঃ স্ত্রীর্দ্দানেনৈব লভ্যতে॥
দানেন শক্রূন্ জয়তি ব্যাধির্দানেন নশ্যতি।
দানেন লভ্যতে বিদ্যা * * *
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষানাং সাধনং পরমস্মৃতম্॥

(হেমাদ্রিধৃত সৌর পুরাণম্)

ত্রিজগতে দানের অধিক আর কিছুই নাই, দানে স্বর্গ ও স্ত্রী লাভ হয়। দান ধর্ম্মের দ্বারা শক্র জয় করা যায় এবং দান ধর্ম্মের দ্বারা ব্যধি সকল নষ্ট নয়। দান দ্বারা বিদ্যালাভ হয়। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ সাধন একমাত্র দানের দ্বারা হয়।

কলিযুগে দানই একমাত্র ধর্ম্ম এবং সর্ব্বার্থসাধক বলিয়া ভক্ত সাধক রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন—

জ্ঞান ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ বটে দান ধর্ম্মোপরি ।
(ওমা !) বিনাদানে মথুরা পারে যাননি ব্রজেশ্বরী ॥

বাস্তবিক দানই পরমধর্ম্ম, দানের কোন ফল কামনা না করিয়া ভগবদাজ্ঞা পালন ও ভগবানের তৃপ্ত্যর্থে যথাসাধ্য দান করা কর্ত্তব্য ।

দান ত্রিবিধ,—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। সাত্ত্বিক দান যথা—

দাতব্যমিতি যদ্দানাং দীয়তেইনুপকারিণে।
দেশেকালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিক স্মৃতম্ ॥
(গীতা ১৭শ অঃ)

প্রত্যুপকারের প্রত্যাশা না করিয়া দেশ কাল পাত্রের উত্তমতা বিচার পূর্ব্বক, কেবল কর্ত্তব্যানুরোধে যে দান করা যায়, তাহাই সাত্ত্বিক দান ।

স্বর্গাদি ফল কামনায় অথবা প্রত্যুপকার প্রত্যাশায় যে দান করা যায় তাহা রাজসিক দান ।

যে দান অনুপযুক্ত দেশে অপাত্রে প্রদত্ত হয় এবং সৎকার রহিত ও অবজ্ঞা পূর্ব্বক প্রদত্ত হয়, তাহা তামসিক দান ।

অতএব সকলেরই ফলাকাঙ্খা বর্জ্জিত হইয়া কর্ত্তব্যানুরোধে দান করা কর্ত্তব্য ।

প্রত্যহ দান করিতে না পারিলেও বিহিত দিনে যথাসাধ্য দান করা কর্ত্তব্য । কোন্ কোন্ দিনে দান কর্ত্তব্য তাহা শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে। যথা—

মাস বৎসর পক্ষাণাম্ আরম্ভ দিন সন্থিকে ।
চতুর্দ্দশ্যষ্টমী শুক্লা তথৈবৈকাদশীকুহূঃ ॥
নিজজন্ম দিনঞ্চৈব পিত্রোর্ম্মরণ বাসরঃ ।
বৈধোৎসব দিনঞ্চৈব পুণ্যকালঃ প্রকীর্ত্তিত ॥

(মহানির্বাণ তন্ত্র ৮ম উঃ)

অর্থাৎ মাসের ও বৎসরের আরম্ভ দিন, পক্ষের আরম্ভ দিন, চতুর্দ্দশী শুক্লপক্ষের অষ্টমী, একাদশী, আমাবশ্যা, নিজের জন্মদিন, পিতামাতার মরণ-দিন এবং বিধিবিহিত উৎসব দিন, অর্থাৎ চন্দ্র, সূর্য্যের গ্রহণকাল, পুণ্যকাল, এই সমস্ত দিন ও পুর্ণতীর্থে দান করা কর্ত্তব্য। কেন না—

পুণ্যতীর্থে পুণ্যতিথৌ গ্রহণে চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ ।
জপদানপ্রকুর্বানং শ্রেয়সাং নিলয়ো ভবেৎ ॥

(মহানির্ব্বাণ তন্ত্র)

পুণ্য তিথিতে, পুণ্যতীর্থে ও চন্দ্রসূর্য্যের গ্রহণকালে জপ ও দান করিলে গৃহস্থ শ্রেয়োভাজন হইবে।

শাস্ত্রে দানের সময়াদি বিষদরূপে বর্ণিত আছে। শাস্ত্রানুমোদিত সময়ে দান করিলে অল্প দানে বেশী ফল পাওয়া যায়। বার, তিথি বিশেষে অক্ষয় হয়। ঐ অক্ষয় দিনে পাপ বা পুণ্য যে কার্য্য করিবে, তাহার আর ক্ষয় নাই।

সোমবারেঽপ্যমাবস্যা আদিত্যাহে তু সপ্তমে
চতুর্থ্যঙ্গারকে বারে অষ্টমী চ বৃহস্পতৌ ॥
অত্র যৎ ক্রিয়তে পাপমথবা পুণ্য সঞ্চয়ঃ।
ষষ্ঠী জন্ম সহস্রাণি প্রাপ্নোতি হি তদক্ষরম্ ॥

(জ্যোতিষ বচন)

সোমবারে অমাবস্যা, রবিবারে সপ্তমী, মঙ্গলবারে চতুর্থী, বৃহস্পতিবারে অষ্টমী হইলে সেইদিনকে অক্ষয় বলা যায়। এই অক্ষয় দিনে পাপ অথবা পুণ্য যে কর্ম্ম করিবে, ষাট হাজার জন্মেও তাহা ক্ষয় না।

উপর্য্যুক্ত সোম প্রভৃতি চারি বারে ঐ সকল তিথির সহযোগ মধ্যে মধ্যে হইয়া থাকে। পঞ্জিকা দেখিলেই জানিতে পারা যাইবে। অতএব অক্ষয় দিনে সামর্থানুসারে কিঞ্চিৎ দান করা এবং জপ পূজাদি যে কোনরূপ ধর্ম্ম ও পুণ্য কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য। দুর্ভাগ্য বশতঃ যদি কেহ না পারেন, তাহা হইলেও অক্ষয় দিনে সতর্কভাবে দিন যাপন করা উচিত। যেন কোনরূপে অধর্ম্ম ও পাপ কার্য্য অনুষ্ঠিত না হয়।

দান দ্রব্যের পরিমাণ অপেক্ষা ফলাধিক্য হইবার জন্য স্বরোদয় শাস্ত্রে দান করিবার একটী বিশেষ বিধি আছে।

ইহার ভাবার্থ এই যে, নিশ্বাস গ্রহণ সময় যাহা কিছু দান করা যায়, সেই দানের ফল কোটি গুণ অধিক হয়।

শ্বাসে সকারসংস্থে তু যদ্দানং দীয়তে বুধৈঃ।
তদ্দানং জীবলোকেঽস্মিন কোটিগুণং ভবেদ্ধিতৎ ॥

(স্বরোদয়)

গৃহস্থগণের কর্ত্তব্য যে, মুষ্টি ভিক্ষা অথবা অর্থ বস্ত্রাদি যাহা দান করিবে, তাহা স্বাভাবিক শ্বাস গ্রহণের সময় দিবে। এরূপ দান করিলে, দান দ্রব্যের পরিমাণাধিক ফল লাভ হইবে।

এই তো গেল প্রথম উপায়, দ্বিতীয় উপায়।

তপস্যা

দান যেমন অবশ্য কর্ত্তব্য, তপস্যাও তেমন অবশ্য করিতে হইবে। যাহার দান করিবার শক্তি আদৌ নাই, অর্থাৎ দীন দরিদ্র নিতান্ত গরীব, এরূপ ব্যক্তি তপস্যা করিলে, দান ধর্ম্ম ব্যতীত সম্পূর্ণ ফল লাভ করিবেন। যাহার যেরূপ অবস্থা এবং অবস্থানুরূপ যে পরিমাণ দান করিবার শক্তি আছে, যাহারা যথাসাধ্য অন্ন, বস্ত্র, অর্থাদি দান যোগ্য বস্তু দান এবং শাস্ত্রসম্মত তপস্যা করিবেন। মোট কথা, দান ও তপস্যা দুই-ই আবশ্যক।

এখন বক্তব্য এই যে, তপস্যা কাহাকে বলে? অনেকেই হয় ত তপস্যার নাম শুনিয়া শিহরিয়া উঠিবেন আর বলিবেন, সত্যযুগে বায়ু ভক্ষণ করিয়া অনাহারে থাকিয়া তপস্যা করিত এখন (কলিযুগে) তাহা কি হয়? এই কথা প্রায়ই লোক-মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। তপস্যার নাম শুনিলে লোকে যেমন ভয় পায় বাস্তবিক তপস্যা একটা ভয়ানক জিনিষ নহে। যাহারা অর্থকেই সার করিয়া অর্থ পাইবার আশায় কত প্রকার

মন্দ কর্ম্ম করিতেছেন, তাহাদের নিকট তপস্যা ভয়ানক অরুচি-কর অতৃপ্তিজনক ; কিন্তু তপস্যা দ্বারা অর্থ ও সুখাদি সমস্তই লাভ করা যায়, তাহা আদৌ বুঝেন না ।

বর্ত্তমানে কালের সংঘর্ষণে, বিজাতীয় শিক্ষার প্রচলনে আজকাল অনেকেই শাস্ত্রবাক্য অবহেলা করিয়া নিজের মত অনুসারে তপস্যা বা সাধনা করিতে প্রয়াসী । এখন নব্যবাবুর দল নিজের ধর্ম্ম কর্ম্ম জানেন না, জাতীয় রীতিনীতি মানেন না, নিজের শাস্ত্র পাঠ করেন না, সমাজের কোন সমাচার রাখেন না এবং আপন জাতীয় চালচলন ছাড়িয়া পরের ভাবে বিভোর হইয়াছেন এজন্য বর্ত্তমান সময়ে নানারূপ নিজের কল্পিত মত প্রবর্ত্তক আসুরী প্রকৃতির অনেক লোক দেখা যায় । কিন্তু নিজের কল্পিত অশাস্ত্রীয় তপস্যা বা সাধনকারীগণকে স্বয়ং ভগবান কি বলিয়াছেন, তাহা হিন্দু মাত্রেই সর্ব্বদা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য ।

ভগবান বলিয়াছেন—

অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপো জনাঃ ।
দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তাঃ কামরাগ বলান্বিতাঃ ॥
কর্শয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ ।
মাঞ্চৈবান্তঃ শরীরস্থং তান্ বিদ্ধ্যাসুর নিশ্চয়ান্ ॥

(গীতা ১৭শ অঃ)

যাহারা অশাস্ত্রীয় তপস্যা করে ও দম্ভ, অহঙ্কার, কাম,

রাগ বলযুক্ত ; তাহারা শরীরস্থ ভূত সমূহকে কৃশ করিয়া আত্মস্বরূপ আমাকেও কৃশ করে ; বিবেকবর্জ্জিত তাহাদিগকে অসুর বলিয়া জানিবে।

ভগবান শাস্ত্রানুসরণ করিতে বারংবার উপদেশ দিয়াছেন। অশাস্ত্রীয় তপস্যা বা সাধনা করিতে ভগবানের নিষেধ। আজ-কাল নব্যবাবুদের মনগড়া ও খামখেয়ালী উপাসনা কিছুই নহে। জাতীয় ধর্ম্ম শাস্ত্রানুসারে উপাসনা বা তপস্যা করা সকলের কর্ত্তব্য।

আমাদের বেদ, স্মৃতি, তন্ত্র, পুরাণ সমুদায় শাস্ত্রই তপস্যার মহিমার বিষয় বলিয়াছেন। মহামতি মনু বলিয়াছেন—দেব এবং মানবের যে কিছু সুখ সম্পত্তি লাভ হয়, সকলের মুল তপস্যা। স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল যে কোন স্থানে অবস্থিতি বল, নিরোগী হওয়া বল, যে কোন বিদ্যা বল—তপস্যা বলে সকলই সাধিত হয়। পাপ, মহাপাপ, উপপাপাদি যত গুরুতর হউক না কেন, সুতপ্ত তপস্যা কর্ত্তৃক সকলই নষ্ট হইয়া যায়। সংসারে যাহা কিছু দুষ্কর, দুষ্প্রাপ্য ও দুর্ল্লভ হউক না তপোবলে সাধিত না হয়, এমন কিছুই নাই। দেবতা ও মানব প্রভৃতি জীব জন্তুগণের সমুদায় দৃষ্টাদৃষ্ট তপোবলে সাধিত হইতেছে দেখিয়া দেবতারা জগৎকে তপোমূল বলিয়াছেন।

তপস্যা আর কিছুই নয় ; উপাসনার নাম তপস্যা। কিন্তু উপাসনা করিতে হইলে, চিত্তের একাগ্রতা চাই। শাস্ত্রে বলিয়াছেন—"উপাসনানিহ চিত্তৈকাগ্রং।" চিত্তের একগ্রতা

লাভ করাই সমুদায় উপাসনা তপস্যার প্রয়োজন। একাগ্রচিত্ত হইলে, মানুষের অসাধ্য কিছুই নাই—একচিত্ত হইলে মনুষ্য মনুষ্যত্বের চরম সীমায় উপনীত হইয়া মুক্তিলাভ করিতে পারে। একথা যোগশাস্ত্রে বিশেষরূপে প্রতিপন্ন আছে। চিত্ত অনুসারে দেবযোনি, প্রেতযোনি, তির্য্যক্‌যোনি ইত্যাদি প্রস্তুত হয়। এই চিত্ত মায়ায় আবৃত হইয়া লোকে অনন্তকাল সংসার চক্রে ঘুরিতেছে। এই চিত্তশুদ্ধির জন্য হিন্দু-শাস্ত্রে কর্ম্মকাণ্ড নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মকাণ্ড অনুসারে সাধন করিলে চিত্তের একাগ্রতা লাভ হইয়া থাকে। একমাত্র ইষ্টদেবের আরাধনায় তাহা সম্পাদিত হইয়া থাকে।

অতএব সকলেরই কর্ত্তব্য যে, স্ব স্ব বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম পালন করিয়া কাম ক্রোধ লোভাদি রিপুদিগকে স্ববশে বশীভূত রাখিয়া পরদ্রব্যে লোভ, পরাস্বপহরণ, পরনিন্দা, দ্বেষ, হিংসা পরপীড়নাদি না করিয়া সত্য, দয়া, শান্তি, ক্ষমাদি সাধু ইচ্ছায় বশীভূত হইয়া সর্ব্বদা পরোপকার করিবে এবং দেবতা, ব্রাহ্মণ, অতিথি, ও পিতামাতা প্রভৃতি গুরুজনের প্রতি ভক্তি ও তাঁহাদের সেবা করিবে। আর গুরূপদিষ্ট ইষ্টমূর্ত্তির প্রতি ও গুরূপদি মন্ত্রে ভক্তি বিশ্বাস স্থাপন করিয়া সর্ব্বদা ইষ্টদেবের আরাধনা করিবে এবং তদগত চিত্ত হইয়া সতত তাঁহার ধ্যানপরায়ণ হইবে। আহারের সময়, বিহারের সময়, শয়নের সময়, ভ্রমণের সময়, কার্য্যের সময়, ধ্যানের সময় এবং সকল কার্য্যে জীব যখন আপনার কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহদিগকে লইয়া আপন ইষ্টদেবে

মন প্রাণের সহিত আত্মসমর্পণ করিতে শিখে, যখন ইষ্টদেব হইতে আপনাকে আর বিভিন্ন বোধ করিতে পারে না, তখন তপস্যার চরম ফল লাভ হয়। তখন সমুদায় সিদ্ধিই আপনা হইতে উপস্থিত হয়।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, শুভ ও অশুভ কর্ম্ম করিলে ভাল ও মন্দ ফলভোগ করিয়া থাকে। অশুভ কর্ম্ম করিলে জীবগণ তীব্র যাতনা ভোগ করে, আর শুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে সুখ ভোগ করে; কিন্তু ফলাসক্ত চিত্ত হইয়া শুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে ঐ কর্ম্ম-শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া ইহলোক ও পরলোকে পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করিতে থাকে। যে পর্য্যন্ত শুভ ও অশুভ উভয় কর্ম্ম ক্ষয় না হয়, সে পর্য্যন্ত বারংবার আসা যাওয়া ও গর্ভযাতনা নিবৃত্তি হয় না। লৌহময় শৃঙ্খল দ্বারা হউক কিম্বা স্বর্ণময় শৃঙ্খল দ্বারা হউক, উভয়বিধ শৃঙ্খল দ্বারা যেমন বদ্ধ হয়। সেইরূপ জীব পাপ ও পুণ্য উভয়বিধ কর্ম্ম দ্বারা বদ্ধ হইয়া থাকে। সেইজন্য জ্ঞানীরা ফল কামনা না করিয়া সমুদয় সৎকার্য্য করেন, তাহাতে বন্ধনের কারণ হয় না এবং জন্ম মৃত্যু রূপ যাতনাও বারংবার ভোগ করিতে হয় না। এ কারণ ফল কামনা না করিয়া দান, ধ্যান, তপস্যা প্রভৃতি কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য। ভগবান বলিয়াছেন—

অফলাকাঙ্খিভির্যজ্ঞো বিধিদিষ্টো য ইজ্যতে।
যষ্টব্যমেবেতি মনঃ সমবীয় স সাত্ত্বিকঃ॥

(গীতা ১৭শ অ:)

অর্থাৎ ফল আকাঙ্খা বর্জ্জিত হইয়া অবশ্য কর্ত্তব্য বোধে যে শাস্ত্রবিহিত যজ্ঞের অনুষ্ঠান হয়, তাহা সাত্ত্বিক, ইহা বন্ধনের কারণ হয় না।

গীতায় কথিত আছে—

যৎকরোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ।
যত্তপসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ্ব সদর্পণং॥
শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্ম্মবন্ধনৈঃ।
সন্ন্যাস যোগ যুগাত্মা বিমুক্তো মামুকৈষ্যসি॥

ইহার ভাবার্থ এই যে,—তুমি হোম কর বা দান কর, বা তপস্যা কর কিম্বা যাহা কিছু কার্য্য কর, তৎ সমস্তই আমাতে অর্পণ কর। এইরূপে সমস্ত কার্য্য করিলে, কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ পূর্ব্বক আমাকে প্রাপ্ত হইবে।

অতএব ফলাভিসন্ধি শূন্য হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। ফল কামনা না করিয়া নিত্যনৈমিত্তিক সমস্ত কার্য্য করিলে জীবের কদাচ বন্ধন হয় না, বরঞ্চ ব্রহ্মজ্ঞান হইয়া থাকে আর নিত্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানে ফলাকাঙ্খা করিতে হয় না। কারণ—

সন্ধ্যামুপাসতে যে তু সততং সংশিত ব্রতাঃ।
বিধুত পাপাস্তে যান্তি ব্রহ্মলোক মনাময়ম্॥

ফল কামনা না করিয়াও যখন ফলপ্রাপ্তি নিশ্চয় তখন ফল আকাঙ্খা করিয়া সংসার পাশে চিরবদ্ধ হইয়া অশেষ দুঃখ

দুর্গতি ভোগ করি কেন? অতএব ফলাভিসন্ধি শূন্য হইয়া সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য।

এইরূপ নিয়মে কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া মৃত্যু সময় স্ত্রী, পুত্রাদি, গৃহ, ধন, জন না ভাবিয়া ইষ্টদেবের প্রতি মন সমর্পণ করিবে।

গীতায় ভগবান বলিয়াছেন—

যং যং বাপি স্মরণভাবং ত্যজ্যন্ত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেধেতি কৌন্তেয় সদা তদভাবঃ ভাবিত॥

মরণকালে যে যাহা ভাবনা করিয়া দেহত্যাগ করে, সে সেই ভাবই প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

মৃত্যুকালে সংসারের কোন বিষয়ে চিত্ত আসক্ত থাকিলে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিয়া দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে। কিন্তু ইষ্টদেবের প্রতি চিত্ত সমর্পণ করিয়া মরিতে পারিলে আর কোন যাতনা ভোগ করিতে হয় না। এইজন্য মৃত্যুকালে বিষয় বিভবাদি ভুলিয়া ইষ্টদেবতার পাদপদ্মে মনপ্রাণ সমর্পণ করা সকলেরই কর্ত্তব্য।

ভগবান বলিয়াছেন—

অনন্তকালে চ মামেব স্মরর্ম্মুক্তা কলেবরম্।
যঃ প্রয়াতি স মদভাবং মাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ॥

(গীতা ৮ম অঃ)

যে ব্যক্তি মৃত্যুকালে ভগবানের চিন্তা করিয়া দেহ পরিত্যাগ

করে সে ব্যক্তি ভগবানের স্বরূপ লাভ করিয়া থাকে, ইহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই।

অনন্য চিত্ত হইয়া ভগবানের চিন্তা করিলে জীব তদবস্থা প্রাপ্ত হয়, সন্দেহ নাই।

যেমন আরসুলা (তেলা পোকা) কাঁচপোকা কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া ভয়ে একান্তচিত্তে কাঁচপোকার চিন্তা করিতে করিতে কাঁচপোকার রূপ প্রাপ্ত হয়। ইহা প্রত্যক্ষ সত্য, এইরূপ অনন্যমনা হইয়া একচিত্ত সহকারে ভগবানের চিন্তা করিলে দেবত্ব প্রাপ্ত হয় সন্দেহ নাই।

অত্যধিক পাপাসক্ত ও নিতান্ত দুরাচারী ব্যক্তিও একাগ্র-চিত্তে ভগবানের ভজন করিলে সর্ব্বপাপ মুক্ত হইয়া পরমাগতি লাভ করিতে পারে।

ভগবান বলিয়াছেন—

অপিচেৎ সুদূরাচারো ভজতে মামনন্য ভাক্।
সাধুরেব সমন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতে হি সঃ॥

(গীতা ৯ম অঃ)

কোন ব্যক্তি নিতান্ত দুরাচারী হইয়াও অনন্য চিত্তে আমার ভজনা করিলে, তাহাকে সাধু বলিয়া জানিবে। যেহেতু তাহার যত্ন অতি সাধু। অন্যত্র উল্লেখ আছে—

অতি পাপ প্রসক্তোহপি ধ্যায়ন্নিমিষচ্যুতং।
ভুয়স্তপস্বীভবতি পংক্তি পাবন নর পামরঃ॥

প্রায়শ্চিত্তান্য শেষানি তপঃ কর্ম্মাত্মিকানিধৈ।
যানিতে যাম শেষাণাং কৃষ্ণানুস্মরণং পরং॥

অত্যধিক পাপাসক্ত ব্যক্তি যদি একাগ্রচিত্তে নিমেষমাত্রও ভগবানের ধ্যান করে, তাহা হইলে সে ব্যক্তি সর্ব্বপাপমুক্ত হইয়া তপস্বী তুল্য হয়। এরূপ ব্যক্তিকে দর্শন করিলে লোক সকল কৃতার্থ হয় এবং তিনি মানবমণ্ডলীর মধ্যে উপবেশন করিলে, মানবগণ পবিত্র হয়। ভগবানের প্রতি একান্ত অনুরাগ এবং ভগবদ্ভক্তি করিলে কোনরূপ প্রায়শ্চিত্ত ছাড়া সর্ব্বপাপ বিনষ্ট হইয়া পরমসুখের কারণ হয়।

সমস্ত জীবনের মধ্যে সুজ্ঞান হয় নাই, মরিতে হইবে ভাব নাই এবং মৃত্যুর পর কি দুর্গতি হইবে, তাহা মনে হয় নাই। কেবল অর্থ অর্থ, স্বার্থ স্বার্থ, করিয়া অনর্থক সময় নষ্ট ও জীবন কলুষিত হইয়াছে। এখন শেষের সে দিন নিকট অর্থাৎ মৃত্যুর পূর্ব্ব লক্ষণ জানিয়া সঞ্চিত অর্থের কিছু দান কর এবং একাগ্রচিত্তে ভগবানের ধ্যান ও স্মরণ কর। তাহা হইলে সর্ব্বপাপ মুক্ত হইয়া পরমগতি প্রাপ্ত হইবে।

আর একটি কথা সকলেই জানেন, ধর্ম্মপতি যমরাজের পার্শ্বে চিত্রগুপ্ত নামে একজন আছেন। তাঁহার নিকট আমাদের পাপ পুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম লেখা রহিয়াছে। ইহার ভাবার্থ এই যে, চিত্রগুপ্তের অর্থ "গুপ্তচিত্র।" এখানে লোকের চক্ষে ধুলি দিয়া বেমালুম পাপ কর্ম্ম করিয়া হজম করা যায়, কিন্তু

সেখানে ধর্ম্মরাজের নিকট আমাদের কর্ম্মের গুরুচিত্রে সমস্তই লেখা রহিয়াছে। কাজে কাজেই নিস্তার নাই। একারণ মৃত্যু নিকট জানিয়া ধর্ম্ম কার্য্যের অনুষ্ঠান ও অনন্ত চিত্তে ভগবানের ধ্যান করা কর্ত্তব্য।

অতএব সকলেরই পূর্ব্ব লক্ষণ গুলি জানিয়া সাবধান হওয়া আবশ্যক। যাহারা রোগী, তাঁহারা মৃত্যুকে নিকট জানিয়া যোগারূঢ় হইয়া প্রাণত্যাগ করিতে চেষ্টা করিবেন। মৃত্যুকালে যদি যোগস্মৃতি বিলুপ্ত না হয়, জন্মান্তরে সিদ্ধি লাভে সমর্থন হইবেন। আর যাহারা যোগী নহেন, তাঁহারা মরণের লক্ষণগুলি দেখিয়া অস্থির না হইয়া এবং যাতনা অনুভব না করিয়া যাহাতে ভগবানের প্রতি সতত মন সমর্পণ করিয়া থাকিতে পারেন, নিয়ত সেই চেষ্টা করিবেন। ভগবানের ধ্যান ও তাঁহার নাম স্মরণ করিতে করিতে মৃত্যুর সম্মুখীন হইলে, আর কোন যাতনা ভোগ করিতে হয় না।

শেষ বক্তব্য এই যে, শাস্ত্র অনন্ত, স্থুল বুদ্ধিতে স্থুল চক্ষে শাস্ত্র বিভিন্ন বলিয়া বোধ হয়, আর সাধনার পথও অনেক প্রকার। শাস্ত্র ও সর্ব্বপ্রকার সাধনের মুখ্য উদ্দেশ্য এক ও ফলও এক। ইহাতে বিভিন্নতা কিছুমাত্র নাই। গুরুর কৃপায় প্রকৃত জ্ঞান লাভ হইলে সাধকগণ তাহা বুঝিতে পারেন।

মথিত্বা চতুরো বেদান্ সর্ব্বশাস্ত্রানি চৈব-হি।
সারন্তু যোগিভিঃ পিতুস্তক্রং পিবন্তি পণ্ডিতাঃ॥

অর্থাৎ সর্ব্বশাস্ত্রের সামঞ্জস্য যোগীগণ দেখিয়া বুঝিয়া থাকেন। এজন্য চারিবেদ ও অন্যান্য শাস্ত্র সকল মন্থন পূর্ব্বক সারভাগ (মাখন) যোগীরা গ্রহণ করেন, আর অসার ভাগ (ঘোল) পণ্ডিতগণ গ্রহণ করিয়া থাকেন। বাস্তবিক পণ্ডিতগণ শাস্ত্রের অসার ভাগ গ্রহণ করিয়া বিরাট তর্কজাল বিস্তার পূর্ব্বক বৃথা বচসা করিয়া বেড়ান। শাস্ত্রের সার গ্রহণ করিবার শক্তি প্রকৃত যোগী ভিন্ন আর কাহারও নাই।

শাস্ত্র অনন্ত, কিন্তু জীবন অল্পকাল স্থায়ী। এক জীবনে কেহ শাস্ত্র পড়িয়া শেষ করিতে পারে না। এজন্য সকলকে "ভগবত গীতা" পাঠ করিতে অনুরোধ করি। যদিও গীতার প্রকৃত অর্থ বুঝাইবার ও বুঝিবার লোক গৃহস্থ লোকের মধ্যে বিরল, তথাপি বারম্বার গীতা পাঠ করা সকলের কর্ত্তব্য। একমাত্র গীতার উপর নির্ভর করিলে অন্য কোন শাস্ত্র পড়িবার আবশ্যক হয় না এবং গীতা পড়িতে থাকিলে গীতা বুঝাইবার গুরু আপনা হইতেই আসিবে।

দীর্ঘায়ু ও অল্পায়ু হইবার কারণ

মনুষ্য শরীরে দিবারাত্র যে শ্বাস-প্রশ্বাস হইতেছে, তাহার নাম প্রাণ; শ্বাস বাহির হইয়া দেহে পুনঃ প্রবেশ না হইলেই মৃত্যু। এই শ্বাস-প্রশ্বাস বায়ু জীবন এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের নাম প্রাণ। এই শ্বাস-প্রশ্বাস হিসাব ধরিয়া হিন্দু-শাস্ত্রে দণ্ড পলাদি নির্ণীত হইয়াছে।

মনুষ্যের নিশ্বাস গ্রহণ সময় অর্থাৎ নাসিকা দ্বারা সহজ নিশ্বাস টানিবার সময় দশ অঙ্গুলি পরিমিত নিশ্বাস ভিতরে প্রবেশ করে। নিশ্বাস পরিত্যাগের সময় বারো অঙ্গুলি শ্বাস বায়ু বহির্গত হয়। যথা —

কায়-নগরমধ্যে তু মারুতো রক্ষপালকঃ।
প্রবেশ দশভিঃ প্রোক্ত নির্গমে দ্বাদশাঙ্গুলাং ॥

(স্বরোদয়)

এই শরীরের মধ্যে বায়ুই রক্ষক পালক অর্থাৎ জীবন মানবের নিশ্বাস পরিত্যাগের সময় বার অঙ্গুলি পরিমাণে প্রাণ বায়ু (নিশ্বাস) নির্গত হয়, ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম। কিন্তু ভোজন, গমন, রমণ, গান প্রভৃতি কার্য্যে শ্বাস-বায়ু (নিশ্বাস) বার আঙ্গুল অপেক্ষা অধিক পরিমাণে নির্গত হইয়া আছে।

কোন্ কার্য্যে কত আঙ্গুল পরিমাণে বায়ু নির্গত হয়, তাহা বলিতেছি—

গমনেচ চতুর্ব্বিংশ নেত্র বেদাশ্চ ধাবনে।
মৈথুনে পঞ্চষষ্টিচ শয়নে চ শতাঙ্গুলাং॥
প্রাণস্য তং গতির্দ্দেবি স্বভাব দ্বাদশাঙ্গুলাং।
ভোজনে বচনে চৈব গতিরষ্ট দশাঙ্গুলাঃ॥

(স্বরশাস্ত্র)

অর্থাৎ মনুষ্য যখন নিষ্কর্ম্মা ভাবে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে তখন শ্বাস বায়ু (নিশ্বাস) বার আঙ্গুল বহির্গত হয়। পথ গমন সময় ২৪ আঙ্গুল ও দৌড়াইলে ৩৪ আঙ্গুল, কথা কহিবার সময়, ভোজন করিবার সময় ১৮ আঙ্গুল, মৈথুনে ৬৫ আঙ্গুল এবং নিদ্রিত হইলে ১০০ আঙ্গুল পরিমিত শ্বাস বহির্গত হয়। ইহা ভিন্ন গান করিলে, ব্যায়াম করিলে ১২ আঙ্গুল অপেক্ষা অধিক পরিমাণে নিশ্বাস নির্গত হইয়া থাকে।

এই শ্বাসে বায়ু যত অধিক পরিমাণে বহির্গত হয়, তত পরমায়ু ক্ষয় হয়। আর যত কম বহির্গত হয়, ততই আয়ু বৃদ্ধি হয় এবং পীড়াদি শারীরিক অসুস্থতাও কম হইয়া থাকে।

স্বভাবেতুস্য গতোমুলে পরমায়ু প্রবর্দ্ধতে।
আয়ুক্ষয়োহষিকে প্রোক্ত মারুতে চান্তরৌদগতে॥

(স্বরোদয়)

অর্থাৎ প্রাণবায়ুর বহির্গত স্বভাবস্থ রাখিতে পারিলে পরমায়ু বৃদ্ধি হয়। কিন্তু নিশ্বাস নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের অধিক যদি হয় তাহা হইলে তাহার আয়ুক্ষয় হয়। নিদ্রা, গান, মৈথুন প্রভৃতি যে যে কার্য্যে প্রাণবায়ু অধিক পরিমাণে বহির্গত হয়, সেইকার্য্য যত অল্প করিবে ততই শরীর সুস্থ থাকিবে এবং দীর্ঘ-জীবন লাভ হইবে সন্দেহ নাই। ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ যোগীগণ যে ব্যক্তি নিয়মিতরূপে প্রাণায়াম করেন, তিনিও দীর্ঘজীবি হন এবং তাঁহার রোগের পীড়নও কম হয়। সুবিজ্ঞ প্রাচীনেরা বলিয়া গিয়াছেন, কার্য্যের গুণে পরমায়ু বৃদ্ধি হইয়া দীর্ঘজীবি হয়। কার্য্যদোষে অল্পায়ু হয়। ইহার অর্থ নিশ্বাস প্রশ্বাস যাহার যত কম খরচ হইবে, তাহার তত পরমায়ু বৃদ্ধি ও রোগাদি কম হইবে। অন্যথায় নানাবিধ পীড়া ও অল্পায়ু হইবে সন্দেহ নাই।

ওঁ শান্তি! ওঁ শান্তি!! ওঁ শান্তি!!!